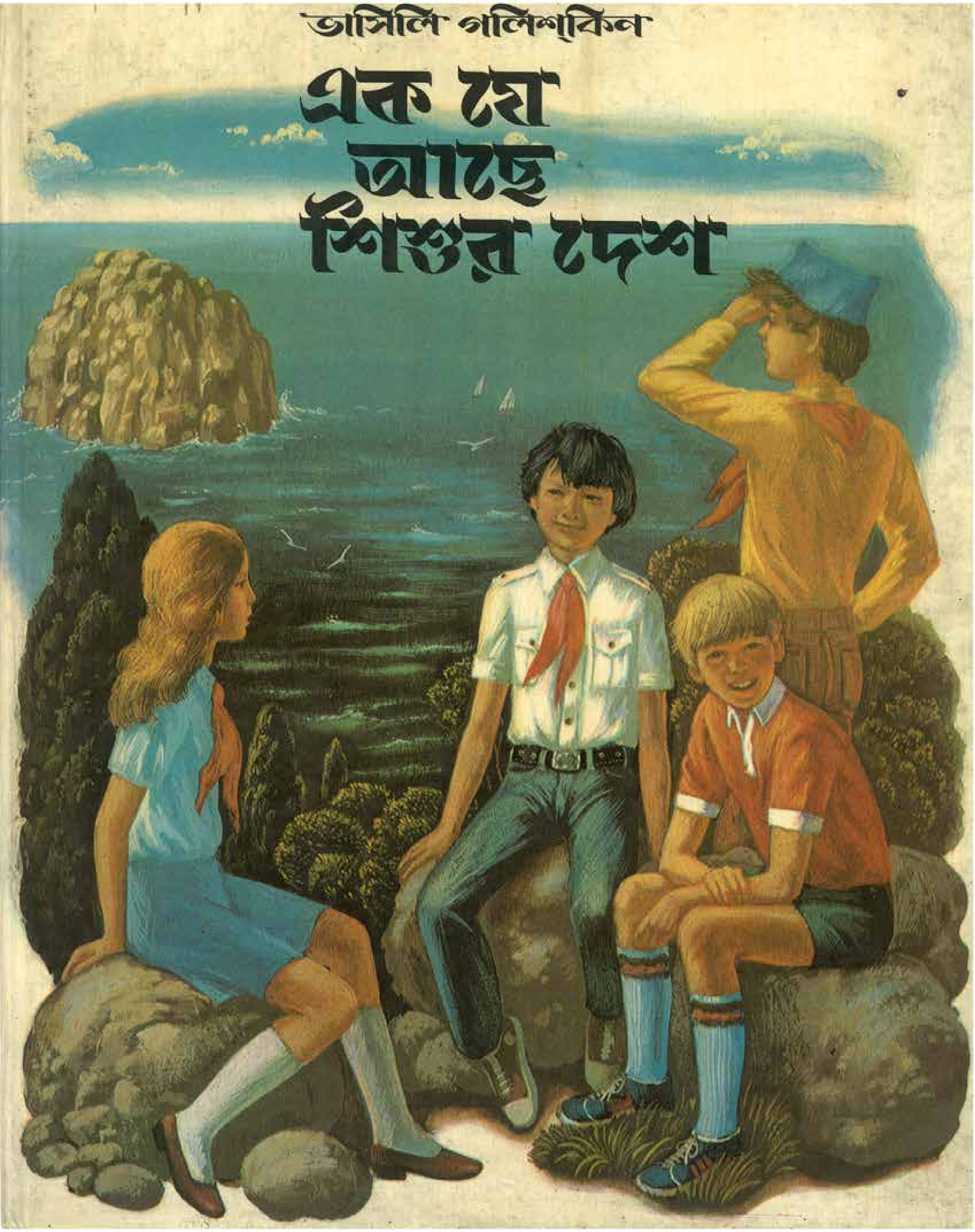
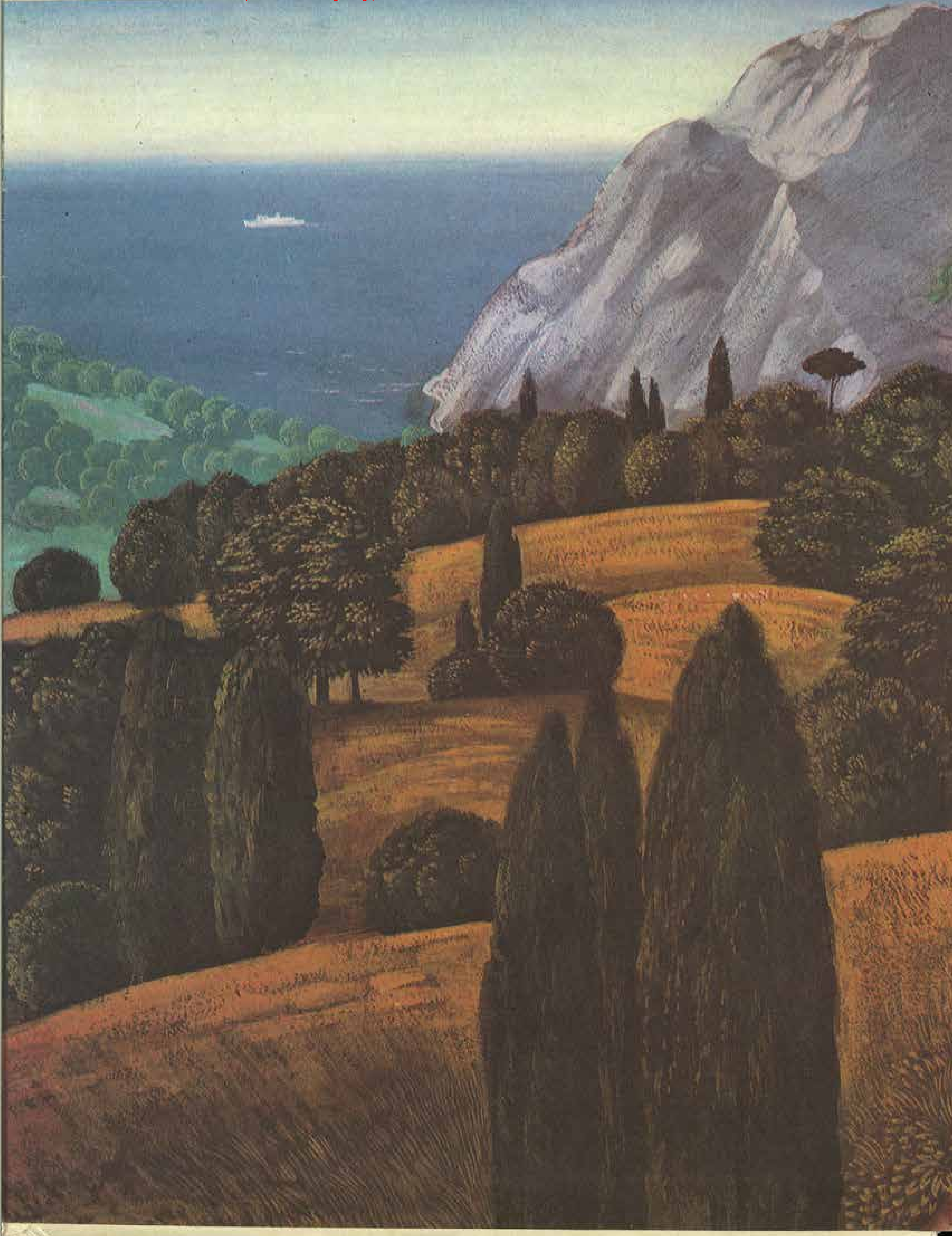
ভাসিলি গলিশ্‌কিন

এক যে আছে শিশুর দেশ







ভাসিলি গলিশ্কিন

এক যে আছে শিশুর দেশ

'রাদুগা' প্রকাশন মস্কো

সূর্য যেন রহে চিরকাল!

মূল রুশ থেকে অনুবাদ: অরুণ সোম

ছবি এ'কেছেন ভাসিলি শুলজেংকো

আলোকচিত্র ও স্লাইড তাস-এর সৌজন্যে:

সের্গেই লিদভ
ভালেরি খ্রিস্তফোরভ
ভ্লাদিমির লাগ্রাঞ্জ
ভিক্তর গুসেভ
ফেলিক্স দুনায়েভ্স্কি
ইউরি মেস্নিয়ান্‌কিন
আলেক্সান্দর ওবুখোভ্স্কি
ও অন্যান্য

В. Голышкин
У САМОГО СИНЕГО МОРЯ
На языке бенгали

V. Golyshkin
THE SEASIDE
"CHILDREN'S REPUBLIC"
In Bengali

Г $\frac{4803010102-159}{031(01)-87}$ 106—87

স্কুলের ছোট বয়সী ছেলেমেয়েদের জন্য

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-05-001226-0

আমাকে চেনো না? আমি আর্তেক!

আমার নাম আর্তেক। আমার জন্মভূমি সোভিয়েত দেশ। এখানে ১৯২৫ সালের ১৬ জুলাই আমার জন্ম। আমি যখন জন্মাই সেই সময় যাদের জন্ম তারা সকলে এত দিনে কাজ থেকে অবসর নিয়েছে, তারা এখন দাদু-দিদিমা। কিন্তু আমি এখনও ছোট, তোমরা যারা এ বই পড়বে তাদের অনেকের মতোই ছোট। আমি মোটে বুড়ো হই নি, স্রেফ বেড়েছি, ধাঁক ধাঁক করে বেড়ে উঠেছি — এই যা। আর দারুণ বড়লোকও হয়ে উঠেছি। আমি এখন বছরে আশি লাখ খরচ করার মতন ক্ষমতা রাখি। তাই বলি কি, আমার কাছে চলে এসো, পস্তাতে হবে না। তুমি যদি এখানে আসার সুযোগ পাও তাহলে ধরে নিতে পার যে তোমার ভাগ্যি ভালো। কথাটা বলছি এই জন্যে যে এখানে আসতে চায় এমন ছেলেমেয়ের সংখ্যা অনেক, আর এই বই নানান দেশের হাজার হাজার ছেলেমেয়ে পড়ার পর তাদের অনেকে আমার আমন্ত্রণের সুযোগ নিয়ে এখানে আসার জন্য ছটফট করবে বৈ কি! আমি কোটিপতি হলে কী হবে আমার নতুন নতুন এত অতিথিকে ঠাঁই দেবার মতো এত ঘরবাড়ি আমি বানিয়ে উঠতে পারি নে।

আমার জীবন শুরু খুব সাধারণ অবস্থা থেকে। আমার প্রথম অতিথি ছিল আমাদের দেশের পাইয়োনীয়র সংস্থার আশি জন ছেলেমেয়ে। তখন তাঁবুতে তাদের অভ্যর্থনা করা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। সমুদ্রের তীর বরাবর ছোটখাটো সমান একটুকরো জমির ওপর দুই সারি করে আটটা তেরপলের তাঁবু খাটানো হয় — চারটে বড়, চারটে ছোট। পাশে ছিল পাইয়োনীয়রদের ছোটখাটো জমায়েতের ও প্যারেড করার জায়গা। আরও কিছুটা দূরে — খেলার মাঠ। ক্যাম্পে দালান বলতে ছিল দুটো ছোট ছোট বাড়ি — একটাতে রান্না আর খাবার জায়গা, অন্যটাতে ছিল ক্লাব আর লাইব্রেরী, ডাক্তারের কাজের ঘর আর কামরা। সেই সময় আর্তেকে যে সব ছেলেমেয়ে আসত তাদের বেশির ভাগেরই স্বাস্থ্য ছিল দুর্বল, তাদের চিকিৎসার দরকার হত। লেনিনগ্রাদ থেকে এক মহিলার লেখা একটা চিঠি আমাদের কাছে আছে। তখনকার কালের কথা মনে করে তিনি লিখছেন: 'এককালের পেত্রোগ্রাদ শহরের শ্রমিক মহল্লার একটি ছোট মেয়ে আমি, ক্রিমিয়ার আর্তেক যখন সবে তৈরি হচ্ছে, সেই সময় সেখানে যেতে পেরে কী খুশিই যে হয়েছিলাম! বেশ কয়েক দিনের পথ। আমাদের সকলের চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, সঙ্গে সামান্য বাক্স পেঁটরা — বেতের ঝুড়ি কিংবা পোর্টম্যাণ্টো। এখানে আমরা অমনিতে চলাফেরা করতাম খালি পায়ে — জুতো যত্ন করে রাখতাম এক্সকার্শনের জন্য আর ফেরার পথে ব্যবহারের জন্য। আমরা থাকতাম তাঁবুতে, ঘুমোতাম তক্তপোষের ওপর। সন্ধ্যাবেলায় ছেলেমেয়েরা কেরোসিনের বাতি জ্বালত। সে সময় একমাত্র যে জিনিসটা প্রচুর মিলত তা হল সমুদ্র আর রোদ।'

প্রথম কয়েক বছরে এখানে যে সমস্ত ঐতিহ্য গড়ে ওঠে তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রবীণ,







আজ থেকে ষাট বছর আগে, যে বছরে আর্তেকের পত্তন, তখন তাকে দেখতে ছিল এই রকম। প্রথম পাইয়োনীয়র, প্রথম শিবির, প্রথম পাইয়োনীয়র প্যারেডের জায়গা, ক্যাম্পের প্রথম পরিচালক — এখানকার এসবই ছিল তখন অভিনব।







অভিজ্ঞ বিপ্লবী যোদ্ধা জিনোভি পেত্রোভিচ সলভিয়োভের নাম। ছেলেমেয়েরা সকলে তাঁকে 'পাইয়োনীয়র প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট' আখ্যা দেয়। এই প্রজাতন্ত্রের জন্য জায়গাটাও তিনিই বাছাই করেন। সন্ধ্যাবেলায় ছেলেমেয়েরা যখন ধুনির পাশে এসে জড় হত তখন সলভিয়োভ তাদের রাশিয়ার শ্রমজীবী জনসাধারণের মহানেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন ও তাঁর পরিবার সম্পর্কে, বিপ্লবের বীর নায়কদের সম্পর্কে নানা কাহিনী শোনাতেন, তাদের সঙ্গে গান গাইতেন।

শিশুপ্রজাতন্ত্রের অধিকৃত এলাকার সীমা বেড়ে চলল। কিন্তু ১৯৪১-১৯৪৫ সালে ফাশিস্ত দখলদারদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত জনগণের যুদ্ধের সময় তা নিদারুণ ভাবে বিধ্বস্ত হয়। ১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে ক্রিমিয়া মুক্ত হওয়ার পর যারা আর্তেকে ফিরে আসে ধ্বংসস্তূপ, ভস্মীভূত পাইয়োনীয়র প্রাসাদ, বিখ্যাত সেকুইয়া, সীডার আর ইউ গাছের পোড়া গুঁড়ি ছাড়া আর কিছু তাদের চোখে পড়ে না। কিন্তু ১৯৪৪ সালের আগস্টেই আর্তেক ফের খোলা হল। প্রথম অতিথি হয়ে এলো যুদ্ধ ফেরতা খুদে বীরেরা, যাদের অনেকেরই বুকে ঝলমল করছিল নানা রকমের যুদ্ধ পদক। এই ভাবে আবার শুরু হল আমার... অভ্যস্ত অতিথিপরায়ণ জীবনযাত্রা।

কৃষ্ণসাগরের পাড় ধরে পাঁচ কিলোমিটার জুড়ে আমার রাজ্যসীমানা — ভালুক-পাহাড় থেকে পুরনো আমলের গেনুয়েজগড়ের ধ্বংসাবশেষ পর্যন্ত চলে গেছে। ঐ গড় আবার প্রাচীন ক্রিমিয়ার গুর্জুফ পল্লী থেকে খুব একটা দূরে নয়। ভালুক-পাহাড় আর সেকালের এই গড় যেন আমার রাজ্যের দুই সীমান্তে দুই প্রহরী। তারা আমার অতিথিদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে নজর রাখে। তবে হ্যাঁ, অতিথিই বা বলি কেন? আমি যাদের এখানে নিমন্ত্রণ করি সেই ছেলেমেয়েরা এখানে বাড়ির মতো স্বচ্ছন্দ বোধ করে — এমন কি বাড়ির চেয়েও বেশি। এখানে তারাই হর্তাকর্তা, আর তাদের মনে লাগার মতো যত বয়স্ক লোকজন — বিভিন্ন ঘটনার নায়ক, মহাকাশচারী, সুরকার, খেলোয়াড় — এরা সকলে তাদের অতিথি হয়ে আসেন। অবশ্য এটা ঠিক যে এখানে পাকাপাকি ভাবে থাকা যায় না, কিন্তু বিশ্বাস কর, এই যাত্রার স্মৃতি তোমাদের মনে চিরকালের জন্য গাঁথা হয়ে থাকবে।

আজ এখানে আছে অট্টালিকা, সৈকতভূমি, পার্ক, খেলার মাঠ, সিনেমা হল, মিউজিয়ম, লাইব্রেরী, এমন কি স্কুলও, কেননা শুধু গরমের ছুটির সময় নয় — সারা বছর, এমন কি স্কুলের মরসুম যখন পুরোদমে চলছে, তখনও এখানে অতিথিদের আসার কামাই নেই।

আমার হেফাজতে যত দালান আছে তার সবগুলো ঘর ঘুরে ঘুরে দেখতে গেলে কয়েক দিন সময় লাগবে।

গরমের সময় এখানে হাজার হাজার গোলাপফুল ফোটে, আর বসন্তকালে উপকূলের পাহাড়গুলো ঢাকা পড়ে যায় চেরি আর আপেলের তুষারশুভ্র ফুলে।

আর্তেক হল জমায়েত আর সমাবেশের জায়গা, রকেট মডেলিং, দৌড় ও অন্যান্য খেলাধুলো প্রতিযোগিতার এবং ছোটদের সাংবাদিকতার জায়গা। আর্তেক বলতে বোঝায় ডাক টিকেট সংগ্রহকারী, খুদে যন্ত্রবিদ, 'সাদা নৌকো' নামে দাবার আসর, মজাদার 'রুশ সুভেনির' উৎসব এবং আরও অনেক অনেক জিনিস।

আমাকে নিয়ে অনেকে অনেক গান বেঁধেছে, বই লিখেছে, তথ্যচিত্র তুলেছে। কিন্তু সম্ভবত সবচেয়ে ভালো হল ছেলেমেয়েরা নিজেরা আমার সম্পর্কে যা লিখেছে।

'আর্তেক হল ছোটদের শহর। এখানে সব কিছু আনন্দের — বাচ্চারা, গাছপালা, ফুল, বাড়িঘর — সব।...'

ইয়োন বুসুইস্ক, বেল্ৎসি, মোলদাভিয়া সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র

'একবার আমাদের নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক হয় — কাদের সাগরপারের ঘাট সবচেয়ে ভালো। 'সাগর' ক্যাম্পের ছেলেমেয়েরা বলল, 'আমাদেরটা!' 'সাইপ্রেস' ক্যাম্পের দল তাতে আপত্তি তুলে বলল, 'সবচেয়ে সুন্দর আমাদের খাঁড়ির সমুদ্র!' এবারে ওদের দুই দলের মাঝখানে এসে 'সুনীল' ক্যাম্প বলল, 'আমাদের সমুদ্রটা কিন্তু সবচেয়ে নীল — সুনীল — গানে যেমন আছে।' আমি কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, আমাদের 'উপকূল' ক্যাম্পের ঘাট কোনটার চেয়ে কম যায় না। এখানে এত রঙবেরঙের নুড়িপাথর আছে!'

সাশা ভিস্‌ক্রেবান্‌ৎসেভ, মস্কো জেলা

'আর্তেকে আমি ড্রাম বাজানোর ক্লাসে ভর্তি হই। আমি বুঝতে পারলাম যে ড্রাম সত্যি সত্যি আনন্দের সাথী। আমি তার সঙ্গে আমার বন্ধুদেরও পরিচয় করিয়ে দিলাম। এখন আমাদের এখানে অনেকে ড্রাম বাজাতে পারে।'

জেনিয়া ভল্‌কোভ, তুলা

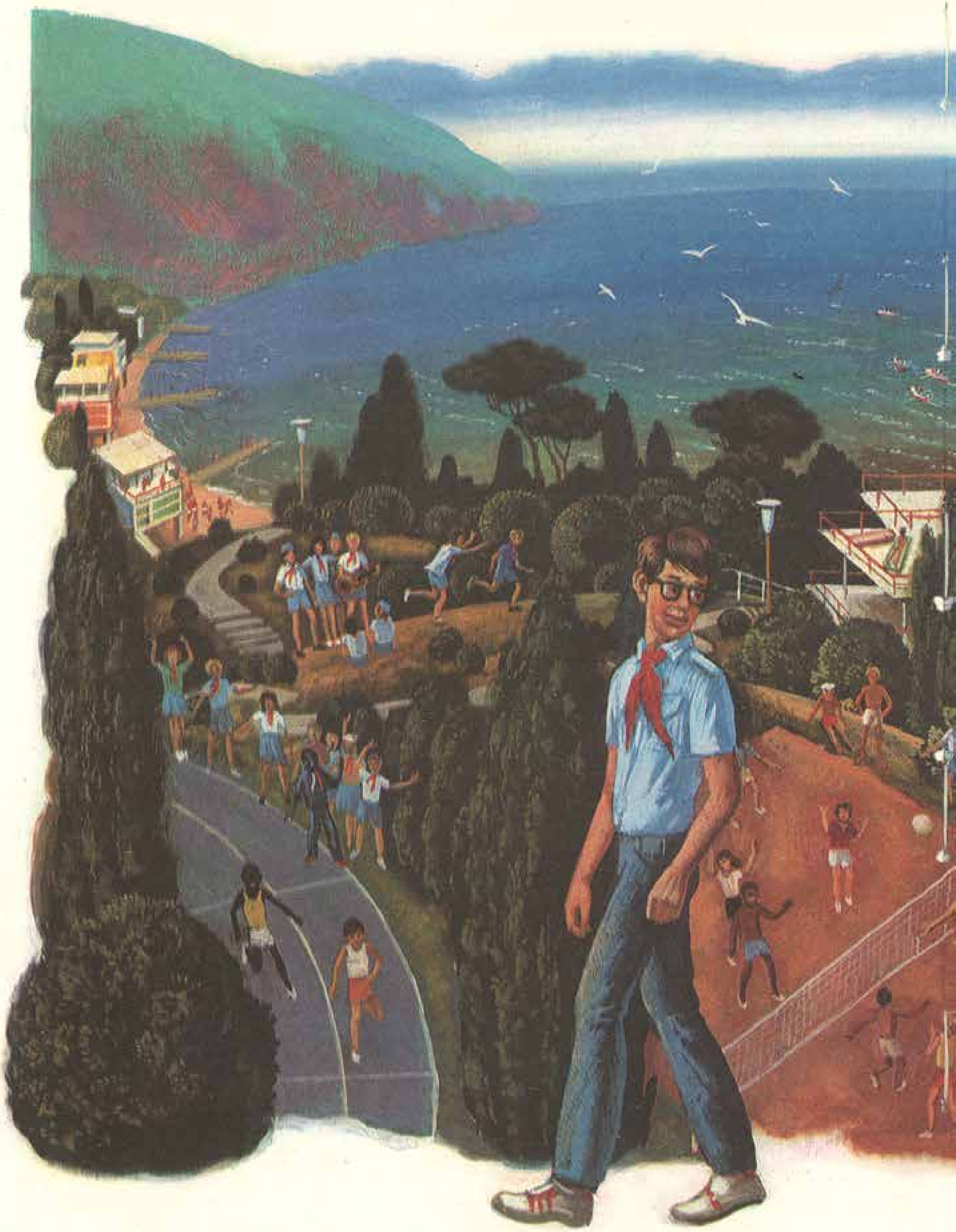
'আর্তেকে আমাদের আছে একটা সত্যিকারের নৌবহর। আছে ডিঙিনৌকো, লঞ্চ, ফেরি-বোট। আমার সৌভাগ্য যে কয়েকবার আমি নৌকোয় চড়তে পেরেছি। আমাদের যেখানে বাড়ি সেখানে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। সমুদ্র নেই। বড় আফশোসের কথা!'

মুসা আইত্‌মাতভ, কির্গিজিয়া

'আমাদের স্কোয়াডে 'রুশ সুভেনির' উৎসবে বেশ মজা হয়েছিল। ছেলেমেয়েরা আর তাদের পাইয়োনীয়র-লীডাররা দালানকোঠাগুলোর গায়ে হরেক রকমের রুশ নক্সা আঁকে, মাথা খাটিয়ে মন-কাড়ার মতন এটা-ওটা জিনিস বার করে। জিতলে, ত তুমি পেলে মেডেল — তাই দিয়ে মেলায় যা তোমার খুশি, কেনো। অন্য ছেলেমেয়েরা তাদের যার যার জাতীয় পোশাকে আমাদের এখানে আসে। আমরা সবাই মিলে রুশী গান গাই।'

কোলিয়া ফেদোতভ, ভোলগগ্রাদ জেলা

'সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে একটা সাক্ষাৎকার আমার বেশ মনে আছে। তাঁরা আমাদের সীমান্ত চৌকি ও পাহারার কুকুর দেখালেন, সোভিয়েত যোদ্ধাদের কীর্তিকাহিনী বললেন। 'আচ্ছা সীমান্ত চৌকিতে কাদের নেওয়া হয়?' আমি সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করলাম। 'কোন একটা কুকুরকে পাহারা দেবার উপযোগী করে শিখিয়ে পড়িয়ে বড় করে তোল, তারপর সীমান্ত রক্ষী হওয়ার ইচ্ছে জানাও — তোমাকে নেওয়া হবে, একশ' বার নেওয়া হবে। চাই কি হয়ত আমাদের কাছেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে,'





তিনি উত্তর দিলেন। এখন আমার সর্বক্ষণের চিন্তা ঐ সীমান্ত, আমি স্বপ্ন দেখি অ্যালসেশিয়ান কুকুরের।'

কোলিয়া তিখমিরভ, নোভ্‌গরদ

'আর্তেকে আমি ছোটদের মেডিক্যাল অ্যাসিস্টেণ্ট গ্রুপে যোগ দিই। তার জন্য আমি এতটুকু পস্তাই নে। আমি ভাঙা হাড় জোড়ার স্প্লিণ্ট্ লাগাতে শিখেছি, ফার্স্ট এইড দিতে শিখেছি। বাড়ি ফিরে এসে আমি আমাদের ইয়ং পাইয়োনীয়র ব্রিগেড-এর মেডিক্যাল অ্যাসিস্টেণ্ট হব।'

ল্যুসিয়া কিরিল্লভা, আমুর জেলা

'রেডিওর কাজ আমার বড় ভালো লাগে। আর্তেকে আসার পর এ কাজ আমার আরও ভালো লেগেছে।'

কোলিয়া সেলিখভ, আর্খান্‌গেল্‌স্ক

'যখনই কোন মহাকাশযান পাঠানোর কথা শুনি তখনই একাডেমিশিয়ান করলিওভের কথাগুলো মনে হতে আমি নিজেকে এই বলে সান্ত্বনা দিই যে 'মহাকাশ বিরাট, সেখানে সকলেরই কিছু না কিছু করার মতো কাজ পাওয়া যাবে।' আর্তেকে আমাদের অনেকে মহাকাশ প্রদর্শনীতে সহিষ্ণুতার পরীক্ষা দেয়। মহাকাশচারীদের ট্রেনিং সম্পর্কে যখন আমরা পড়ি তখন মনে হয় এসব কতই না সোজা! কিন্তু সেণ্ট্রিফুগের মধ্যে পড়ে যখন তোমাকে চর্কিবাজি খেতে হয় তখনই বুঝতে পার কী জোরাল পেশীর দরকার!'

ভ্লাদিস্লাভ সিমাগিন, মর্দোভিয়া সোভিয়েত স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র

'ওঃ, আর্তেকে বিজয়ীদের কী সম্মানই না দেওয়া হয়! স্প্রিণ্টে জয়ের জন্য আমাকে যখন মেডেল দেওয়া হল সেই মুহূর্তটি কখনও ভুলবার নয়। এটা ছিল আমার জীবনের প্রথম পদক। এর পর আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম যে সব সময়, সারা জীবন আমি খেলাধুলো চর্চা করব!'

তামারা স্তারুখিনা, দনেৎস্ক জেলা

'খুব ভোরে, ভাল্লুক-পাহাড়ের মাথার ওপর তখনও কালো মেঘের কুণ্ডলী উঠছে— আমরা সফরে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা পর পর সার বেঁধে চললাম। পাহাড় যত উঁচুতে উঠে গেছে উঠতে তত কষ্ট। কিন্তু কেউ সে জন্য চ্যাঁ-ভ্যাঁ করল না। পথে আর্তেকের সকলের চেনা একটা বিশেষ ওকগাছ পড়ল। তাকে দেখতে পেয়ে আমরা সকলে চেঁচিয়ে অভিনন্দন জানালাম। আমাদের পর যারা ওখানে আসবে তাদের জন্য চিঠি লিখে আমরা ওকগাছটার কোটরে ফেলে দিলাম। এটাই এখানকার রীতি। তারপর আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম মহাশিলার ধারে, যেখান থেকে হাতের পাঁচটা আঙুলের মতো গোটা আর্তেক স্পষ্ট দেখা যায়।'

সেরিওজা ইভানভ, লিপেৎস্ক জেলা



'কোথাও চলতে গেলে কী ভাবে দিক ঠিক করতে হয় আর্তেকে এসে আমি তা শিখলাম। আমাকে এটা শেখায় আমার নতুন বন্ধু। আমি যখন বাড়ি ফিরে আসব তখন অবশ্যই পদযাত্রা আর সব রকমের খেলাধুলোর বন্দোবস্ত করব।'

স্লাভা পেতুখভ, ল্ভোভ

'আমার মনে হয় জগতে যদি নাচ না থাকত তাহলে জীবন অনেক পরিমাণে নীরস হয়ে যেত। বইপুথি না থাকলে, সূর্য বা ফুল না থাকলে যেমন অবস্থা হত। আর্তেকে একটা দিনও নাচ ছাড়া যায় না, আর তার ফলে মন এত আনন্দে ভরে ওঠে!'

মারিনা জেলেন্স্কায়া, উস্সুরিইস্ক

বেড়াতে চলে এসো

ক্রিমিয়ায়, কৃষ্ণসাগরের তীরে সামনের পায়ের দুই থাবা জলের ভেতরে ডুবিয়ে শুয়ে আছে একটা বেশ ভালোগোছের লোমশ জানোয়ার। জানোয়ারটা যে ঠিক কী, কাছ থেকে দেখে ভালোমতো বোঝার উপায় নেই। একটু পিছে সরে গেলে দেখতে পাবে আসলে সেটা একটা ভাল্লুক, কিংবা প্রায় ভাল্লুকের মতো দেখতে একটা পাহাড়। এর নামও তাই আয়ু-দাগ বা ভাল্লুক-পাহাড়।

ক্রিমিয়ার এক কিংবদন্তীতে বলা হয়েছে যে বহুকাল আগে, সে কবেকার কথা বলা যায় না, এখন যেখানে আয়ু-দাগ পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে ভাল্লুকদের বাস ছিল। তারা ছিল দৈত্যাকার ভাল্লুক। একবার ভাল্লুকদের আস্তানার এই পাড়ে ছোট্ট একটা মেয়েকে নিয়ে এক ছোট নৌকো এসে ভিড়ল। মেয়েটাকে ভাল্লুকদের ভালো লাগল, তারা ওকে ওদের সঙ্গে থাকার জায়গা করে দিল। মেয়েটা বড় হয়ে উঠল — সুন্দর, হাসিখুশি এক কিশোরী হয়ে উঠল। সে এমন গান গাইত যে তা শুনে ভাল্লুকেরা তাদের ঘুমের কথা ভুলে যেত, শিকারের কথাও ভুলে যেত।

এক দিন নৌকো চালিয়ে ভাল্লুকদের এই আস্তানায় এসে হাজির হল সুন্দর চেহারার এক যুবক। ছেলেটা আর মেয়েটা একে অন্যকে ভালোবাসল। তারা দু'জনে ভাল্লুকদের ছেড়ে পালিয়ে গেল। গোপনে তারা সমুদ্রে ভেসে পড়ল। জন্তুগুলো এ খবর জানতে পেয়ে ভয়ঙ্কর খেপে গেল। আর ভাল্লুকদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় সেই ভাল্লুকসর্দার সমুদ্রের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে জলের সঙ্গে সঙ্গে পলাতকদেরও গিলে ফেলার মতলব করে বড় বড় ঢোকে জল গিলতে আরম্ভ করল। কিন্তু বিপদ দেখতে পেয়ে মেয়েটা ভালোবাসা আর সুখের বিষয় নিয়ে গান শুরু করে দিল। সর্দার-ভাল্লুক মিঠে গান শুনে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল। এই যে দুটি ছেলে আর মেয়ে একজন আরেকজনকে ভালোবেসেছে, তাদের অনিষ্ট সে করতে পারল না। সমুদ্রের ধারে সে যেমন ছিল তেমনি জমে গেল চিরকালের মতন।

এই কিংবদন্তী ছড়ানো পাহাড়টার সামনে থেকেই শুরু হয়েছে শিশুরাজ্য আর্তেক। এ এক হাল ফ্যাশনের নতুন ক্যাম্প-নগরী। তার মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের স্মৃতিমূর্তি।

সমুদ্রের একেবারে ধার ঘেঁষে অলিভ, ম্যাগ্নোলিয়া আর বে-গাছের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে 'সাগর' ক্যাম্প। ছেলেমেয়েদের রাতে ঘুমানোর জন্য যে-সমস্ত সুন্দর-সুন্দর দালানকোঠা এখানে আছে সেগুলো রোদে ঝলমল করছে, দেখাচ্ছে একটা সমুদ্রযাত্রার লাইনারের ডেক-এর মতো।

ক্যাম্প-নগরীতে ঢোকার মুখে পৃথিবীর সব দেশের ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্বের একটা স্মৃতিস্তম্ভ।

'সাগর' ক্যাম্পের মাঝখানে, 'মৈত্রী' চকে সব সময় লেগে আছে বহু লোকের ভিড়, কিংবা বলা যেতে পারে বহু দেশের ভিড়, কেননা সারা বছর ধরে আর্তেকে পৃথিবীর সব দেশের শিশুদের আসার আর কামাই নেই।

আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে আমরা নীচের ক্যাম্প থেকে চলে যাই ওপরকার 'পাহাড়' ক্যাম্পে। একটা আচমকা সরু বাঁক ঘুরলেই আমাদের সামনে পড়বে এক ভূলুণ্ঠিত মহাকায় মূর্তি — ১৯৪৩ সালে ক্রিমিয়া রণাঙ্গনের যুদ্ধে নিহত অজানা নাবিকের স্মৃতিমূর্তি।

১৯৪১ সালের জুন মাসে ফাশিস্তরা সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর হানা দিলে যে-সমস্ত সোভিয়েত মানুষ তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এই 'অজানা নাবিক' সেই অনেকের একজন। ভয়ঙ্কর কঠিন সে যুদ্ধ চলে অনেক দিন ধরে। সোভিয়েত জনগণ তাকে পিতৃভূমির মহাযুদ্ধ নাম দেয়, যে-সব সৈন্য রণাঙ্গনে নিহত হয়েছে তারা তাদের স্মৃতিকে পবিত্র জ্ঞান করে। যুদ্ধে নিহত বৈমানিক, নাবিক, ট্যাংকসৈনিক, পদাতিক সৈনিক, স্কাউট আর গোলন্দাজদের স্মৃতিতে সোভিয়েত ভূমিতে শত শত স্তম্ভ আর মূর্তি গড়ে উঠেছে।

এই হল দ্বিতীয় ক্যাম্প, 'পাহাড়' ক্যাম্প। বরফের মতন সাদা ঝকঝকে এখানকার দালানকোঠাগুলো। 'পাহাড়' ক্যাম্পের দর্শনীয় বস্তু হল গবেষণার জন্য বিশেষ ভাবে সংরক্ষিত একটা নামকরা উদ্ভিদ-উদ্যান। উদ্যানের পেছনে আর্তেকের স্কুলের আলো-হাওয়া খেলানো দালান। কিন্তু দালানটা নিছক স্কুল-দালান নয়। এখানে হবি-গ্রুপের কাজের জায়গা আছে, টেকনিক্যাল কাজ ও নৌবাহিনীর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা আছে; শুটিং গ্যালারি, ফোটোল্যাবরেটরি, 'আমার জন্মভূমি — সোভিয়েত ইউনিয়ন' প্রদর্শনী, 'আর্তেকফিল্ম' স্টুডিও এবং আর্তেক রেডিও স্টেশনও এই দালানে আছে। আর স্কুলের সামনে আছে একটা চত্বর, যেখানে অ্যাসফল্টের ওপর... হ্যাঁ, বিশ্বাস কর, অ্যাসফল্টের ওপর প্রতি বছর ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা হয়।

স্কুল থেকে খানিকটা নীচে নেমে গেলে রাস্তা পেরিয়ে আর্তেকের বিশাল স্টেডিয়াম, যেন একটা পেয়ালা। সেখানে পিরিচ-আকারের মরকত-সবুজ ফুটবল মাঠের চারধারে কণ্ঠহারের মতো গোল হয়ে ঘুরে গেছে ছাইরঙা দৌড়ের ট্র্যাক। স্টেডিয়ামের পাশে সুইমিং-পুল।

'পাহাড়' ক্যাম্প থেকে আমরা ফের নেমে যাই নীচে — 'উপকূল' ক্যাম্পে। এখানে আছে আর্তেকের সবচেয়ে বড় গোলাপবাগ। এখানে একটু দাঁড়িয়ে সমুদ্রের নোনা হাওয়া মেশানো

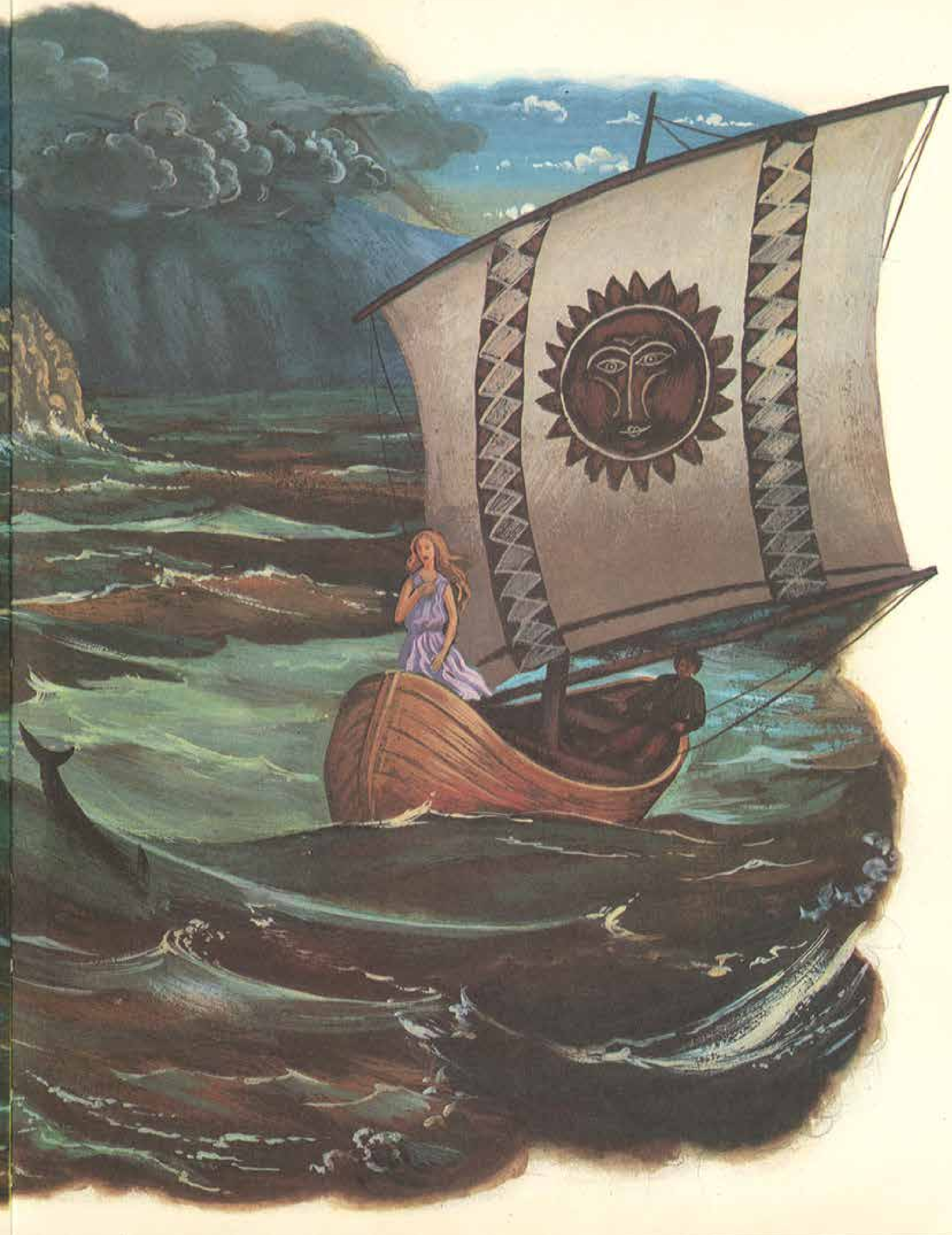
গোলাপের হালকা গন্ধ শ্বাসভরে নেওয়া যাক। তারপর নেমে যাই আরও নীচে, উপকূল সরণির দিকে — তারই লাগোয়া দেখতে পাব বন্দর। সেখানে ঢেউয়ের মাথার ওপর নাচছে আর্তেকের গৌরবময় নৌবহর — ক্ষিপ্রগতি লঞ্চ, দ্রুতগামী মোটর বোট আর বড় বড় ফেরী বোট। নৌবহর পরিচালনার দায়িত্বে আছে ফ্ল্যাগশিপ 'আর্তেক'।

নানা দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে লাগানো গাছপালায় সাজানো 'মৈত্রী' উদ্যানের পাশ দিয়ে আমরা যদি আবার ওপরে উঠে যাই (পুরো আর্তেকটাই এরকম — কখনও নীচে, কখনও বা ওপরে চলে গেছে), তাহলে এসে উপস্থিত হব আর্তেকের পাইয়োনীয়র প্রাসাদের ঢোকার মুখে। সারা সোভিয়েত ইউনিয়ন লেনিন পাইয়োনীয়র সংস্থার ইতিহাসপ্রদর্শনী এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম মহাকাশপ্রদর্শনী এই ভবনে আছে।

১৯২২ সালে মস্কোয় ১০-১৫ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য পাইয়োনীয়র নামে সংস্থার প্রথম প্রতিষ্ঠা। পাইয়োনীয়র সদস্যরাই ঠিক করে তাদের সংস্থার প্রতীক — লাল ব্যানার, পতাকা, লাল টাই, ব্যাজ।

ছেলেমেয়েদের সবচেয়ে মজার জীবনযাত্রা শুরু হয় গরমকালে পাইয়োনীয়র ক্যাম্পে। মন কাড়ার মতো এত সব কাজ এখানে আছে যে কোন্ কাজে হাত দেব ভেবে কূল পাওয়া যায় না, সবই করতে সাধ হয়। ইচ্ছে করে পদযাত্রায় বেরিয়ে পড়ি, পাইয়োনীয়র বিউগলে সকালে ওঠার বাঁশি বাজাই, পাইয়োনীয়র ক্যাম্প ফায়ার নামে চমৎকার উৎসবে যোগ দিই।







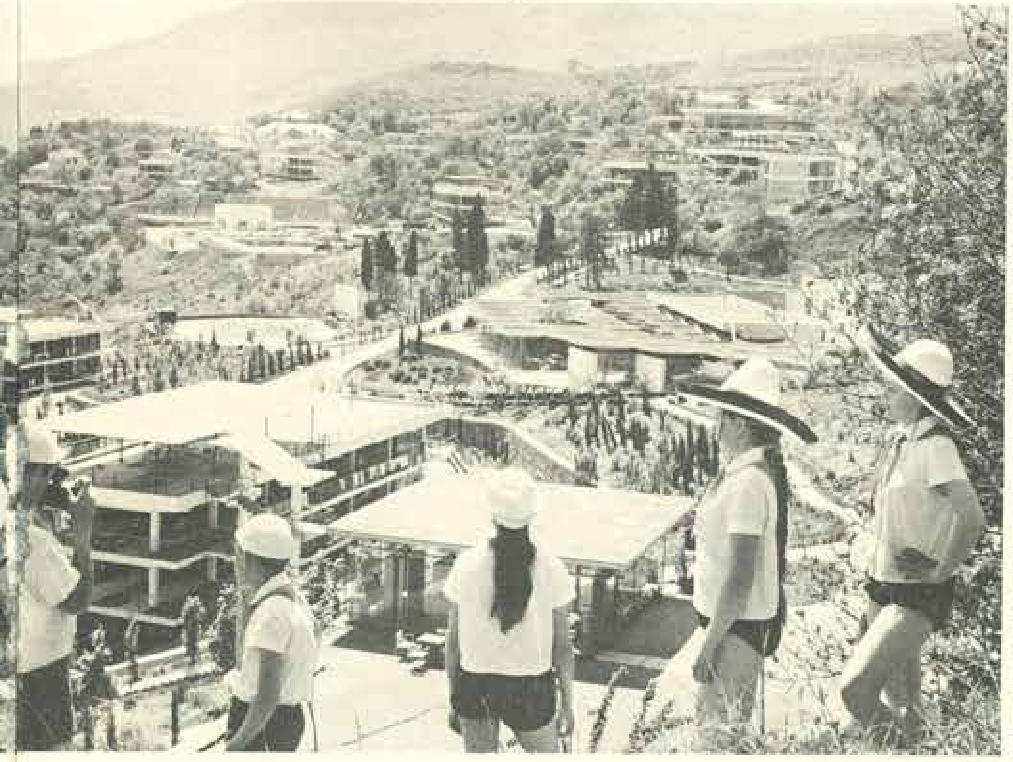


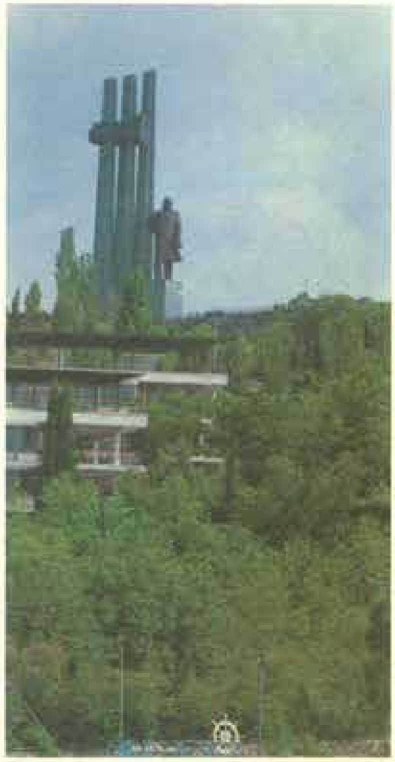


যুদ্ধের পর নতুন করে গড়ে তোলা আর্তেকের দৃশ্যপট। রাত্রিযাপনের নতুন নতুন ব্লক। অজানা নাবিকের স্মৃতিমূর্তির সামনে গার্ড অব অনার। যে-সমস্ত আর্তেক সদস্য মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধে নিহত হয়েছে তাদের নাম লেখা স্মৃতিফলকের সামনে আনুষ্ঠানিক প্যারেড।





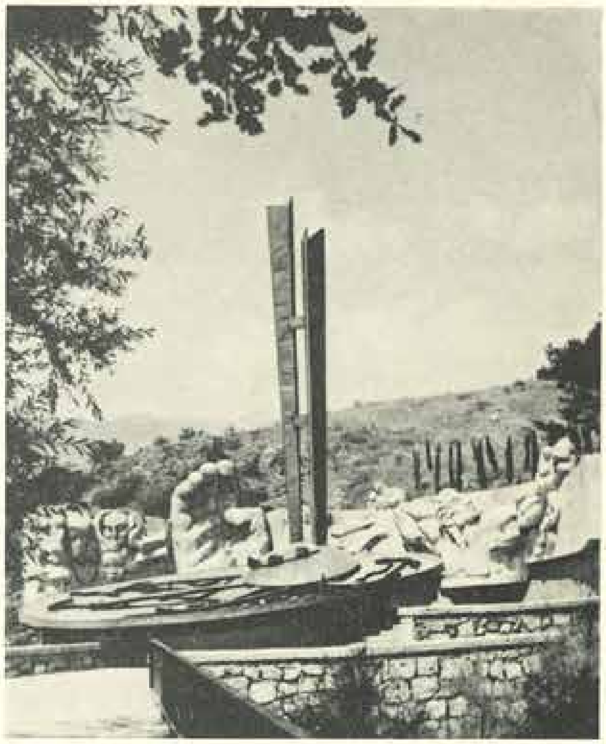




লেনিন স্মৃতিমূর্তি এবং 'মৈত্রী' চক, যেখানে এখন ক্যাম্পের বহু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।







পাইয়োনীয়র প্রাসাদ থেকে পথ চলে গেছে আর্তেকের 'ইতিহাসপ্রসিদ্ধ' 'সুনীল' ক্যাম্পে। এখানকার সব কিছুতে ইতিহাসের স্পন্দন — প্রাচীন উদ্যান, সুনীল সাগরের খাঁড়ি, ছবির মতো সুন্দর গুহা — সবেতেই। আর এই যে সেই গুহা, তার ওপরকার সেই শিলাটা আর সেই কুঞ্জটা — সমস্তটাই পুশ্‌কিনের স্মৃতি বিজড়িত, মনে করিয়ে দেবে পুশ্‌কিনের কথা। কোন এক সময় পুশ্‌কিন ক্রিমিয়াতে ছিলেন। তখন তিনি এই জায়গাগুলোতে ঘোরেন।

রুশ দেশের সুমহৎ কবি আলেক্সান্দর পুশ্‌কিন (১৭৯৯-১৮৩৭)-এর নাম কে না জানে? কেবল বয়স্করা কেন, ছোট ছেলেমেয়েরাও জানে। পুশ্‌কিন ক্রিমিয়া আর কৃষ্ণসাগর ভালোবাসতেন। এদের ওপরে তাঁর বেশ কিছু সুন্দর সুন্দর কবিতা আছে। বিশেষ করে লোকের কাছে পরিচিত হল 'সমুদ্রবিদায়' কবিতার এই পংক্তিগুলো:

হে মোর নিসর্গ, তব মহিমা অপার!
আজি এই শেষবার, বিদায় বেলায়
সুনীল তরঙ্গরাশি সমুখে আমার
ঢালি দিলে। দেখা দিলে দৃপ্ত গরিমায়।

পাথরের কালপঞ্জীর একটা নতুন পৃষ্ঠা। যে চকের ওপর পাইয়োনীয়র দলের সদস্যরা প্যারেড করে সেখানে একটা স্মৃতিফলকের গায়ে খোদাই করা আছে পিতৃভূমির মহাযুদ্ধে এককালের আর্তেক-ক্যাম্পের যারা যারা নিহত হয়েছে তাদের সকলের নাম।

আমাদের যাত্রাপথের শেষ ক্যাম্প 'সাইপ্রেস'। যার নামে এই ক্যাম্পের নাম সেই সাইপ্রেস গাছের জন্য এখানকার খ্যাতি।

একটু ভালো করে লক্ষ করলে ক্যাম্পের মাথার ওপর দেখতে পাবে একটা শৈল — তার চূড়ায় শোভা পাচ্ছে গেনুয়েজ গড়ের ধ্বংসাবশেষ। শৈলের সামনে আছে আলেক্সান্দর সের্গেইয়েভিচ পুশ্‌কিনের একটা ছোট স্মৃতিমূর্তি।

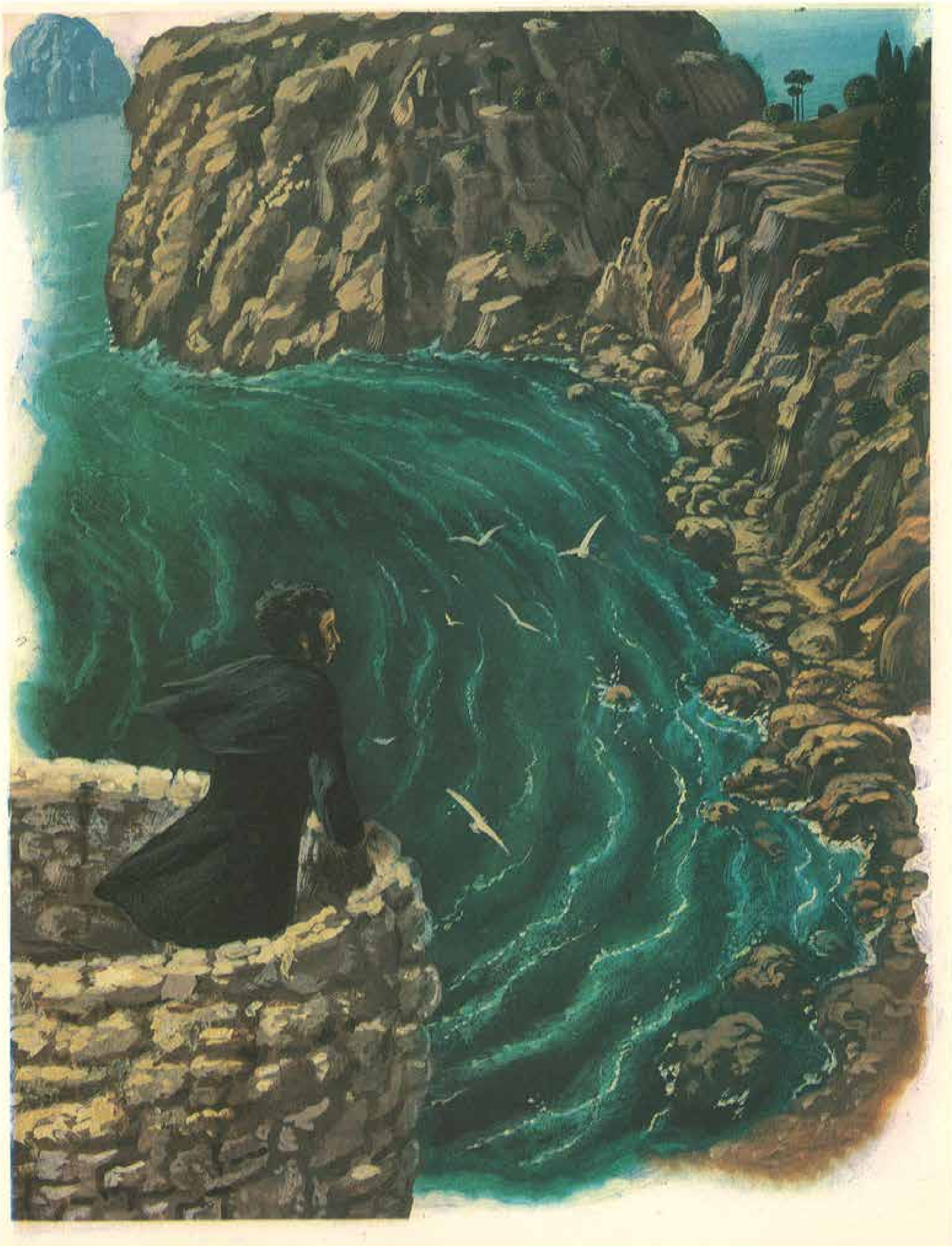
রূপ বদল

আর্তেকে দেখার জিনিস অনেক — পার্ক, পাহাড়পর্বত, স্মৃতিমূর্তি। কিন্তু আর্তেকের সবচেয়ে বড় গৌরব তার সমুদ্র! সমুদ্র ছাড়া আর্তেক আর্তেকই নয়। এই জন্য বাস-এ চেপে ক্যাম্পে আসতে আসতে সকলেরই দু'চোখ প্রথম যা খুঁজে বেড়ায় তা হল সমুদ্র। এই যে সেই সমুদ্র — দিনের একেক সময় একেক রকম — সকালে গাঢ় নীল, দিনের বেলায় আকাশী, সন্ধ্যায় কালো।

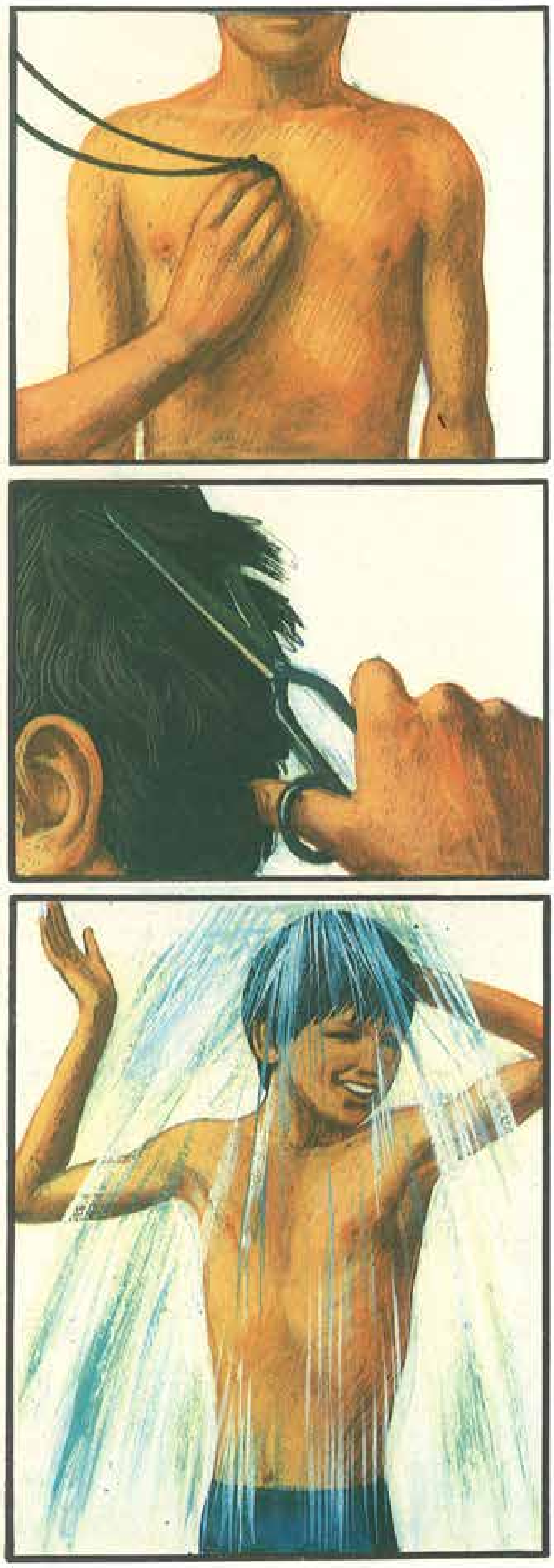
'সমুদ্র!' যারা তাকে প্রথম দেখে তারা উল্লসিত হয়ে ওঠে। তারপর ভালো করে দেখে আর সব — পাহাড়পর্বত, গুহা, আর যেখানে তাদের বাস করতে হবে সাদা রঙের সেই সব দালানকোঠা।

একটা বিরাট কাচের দালান এফোঁড় ওফোঁড় করে চলে গেছে সূর্যের আলো। বাস তার সামনে এসে ব্রেক কষল।

'এটা কিসের দালান?'







'রূপ বদলের বাড়ি,' ছেলেমেয়েদের বাস থেকে নামানোর সময় মুচকি হেসে রহস্য করে বলল ড্রাইভার।

ওলিয়া আর কোলিয়া আর্তেকে এসেছে সাইবেরিয়া থেকে। কোলিয়ার মতে ওলিয়া সুন্দরী। কিন্তু নিজের সম্পর্কে তার ধারণা তেমন উঁচু নয়। তার মতে সে আনাড়ি গোছের, তাকিয়ে দেখার মতো কিছু নয়। রূপ বদল করতে যাও আর যাই কর যেমন আছে তেমনই থেকে যাবে।

ওলিয়া আর কোলিয়া দালানের ভেতর ঢুকতে না ঢুকতে কী হতে চলেছে বোঝার আগেই কোন্ এক যাদুমন্ত্রবলে যেন তাদের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল — কোলিয়া এসে পড়ল শুধু ছেলেদের একটা দলের মধ্যে, আর ওলিয়া— শুধু মেয়েদের। সেই যাদুমন্ত্রবলটার নিজেরই যেন ছিল অনেকগুলো মমতামাখানো হাত, চোখ আর কান। কান কোলিয়ার বুক পরীক্ষা করল, চোখ তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, আর হাত যা করল সেটা তার চেয়েও বেশি — চুল ছেঁটে দিল, তাকে স্নান করিয়ে দিল, সুন্দর জামাকাপড় পরিয়ে দিল।

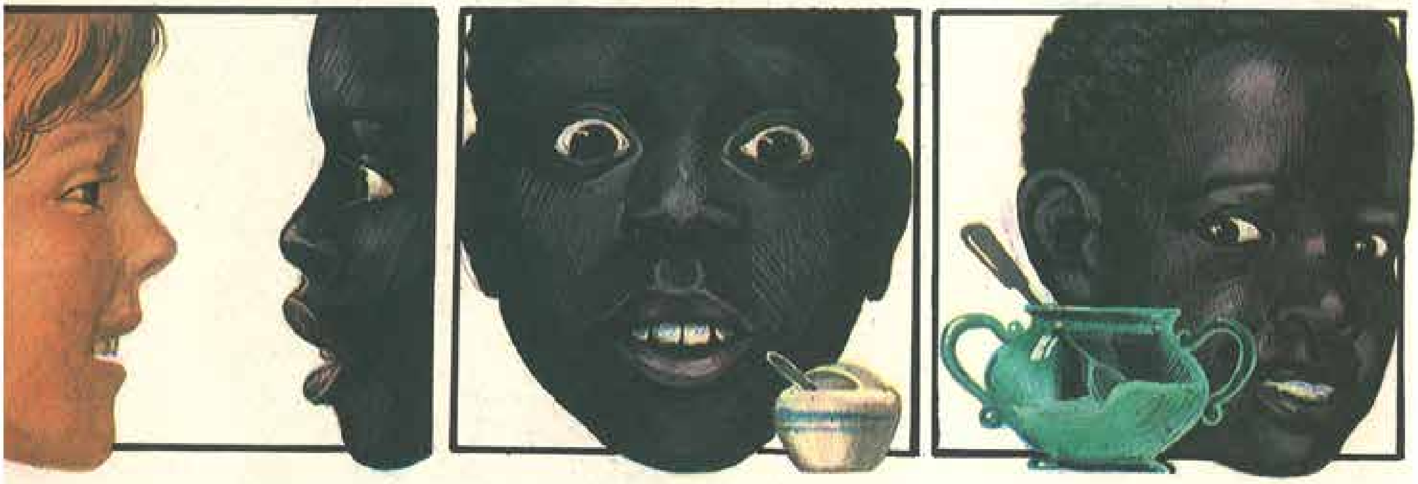
সব শেষ হয়ে গেলে পর কোলিয়া পার্কে এসে হাজির। আর সকলের পরনে সাদা শার্ট, নীলরঙের হাফপ্যাণ্ট, গলায় লাল টকটকে টাই, পায়ে সাদা মোজা আর খয়েরি রঙের স্যাণ্ডেল দেখতে তার বেশ লাগছিল।

সে মনে মনে ভাবছিল সে নিজেও কি এই এদের মতোই দেখতে হয়েছে? এমন সময় দেখতে পেল তার দেশের মেয়ে ওলিয়া ছুটতে ছুটতে আসছে। কোলিয়াকে দেখে সে অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বলল, 'কী সুন্দর লাগছে রে তোকে দেখতে!'



পথে একটা দল যাচ্ছিল — রোদে পোড়া সুন্দর গড়নের ছেলে আর মেয়েরা। তাদের মাথায় সাদা পানামা টুপি, পরনে নীল রঙের হাফপ্যাণ্ট আর শার্ট। রিসেপশন বিল্ডিং-এর কাছে নবাগতদের দেখতে পেয়ে সকলে একসঙ্গে সমস্বরে চেঁচিয়ে বলল, 'সবাইকে সুপ্রভাত জানাচ্ছি, সবাইকে!'

'সুপ্রভাত!' নবাগতরা উত্তরে কলবল করে নানা স্বরে বলল। তারা এখনও খাঁটি আর্তেকবাসী হয় নি কিনা, তাই আর্তেকের ছেলেমেয়েদের মতন অমন গুছিয়ে, সমস্বরে অভিনন্দন জানাতে কিংবা অভিনন্দনের উত্তর জানাতে এখনও শিখে উঠতে পারে নি। তবে যাই হোক না কেন, দুই দলের কথার মধ্যেই সত্যতা ছিল — সত্যি সত্যি আর্তেকের মাথার ওপর, ক্রিমিয়ার মাথার ওপর, সমস্ত দেশের মাথার ওপর দেখা দিয়েছে সূর্যের আলো ঝলমলে সুন্দর প্রভাত।



'বরফ বরফের মতোই!'

আর্তেকের প্রথম কয়েক দিন — আলাপ-পরিচয়ের দিন। সেরিওজা আলেক্সেয়েভের ভাগ্য রীতিমতো ভালো বলতে হবে। তার বড় সাধ ছিল কোন আফ্রিকান ছেলের সঙ্গে আলাপ করে। সে সুযোগেও মিলে গেল। আফ্রিকার সেই ছেলেটার নাম মারিয়ান। ছেলেটা ফুর্তিবাজ, আর সব ব্যাপারে তার কৌতূহলও আছে। সে গান করত, আর গান যখন না করত তখন কোন না কোন ব্যাপারে নির্ঘাত প্রশ্ন করত।

একদিন সে সেরিওজাকে জিজ্ঞেস করল, 'বরফ কী জিনিস?'

সেরিওজা বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু মারিয়ান কিছুতেই কিছু বোঝে না। তখন সেরিওজা ভাবল ওকে বলে বোঝানোর চেষ্টা করার চেয়ে দেখানো সহজ। তাই সে খাবারের ঘর থেকে এক মুঠো নুন নিয়ে এসে ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে তাকে চেঁচিয়ে বলল:

'এই দেখ, বরফ দেখতে এই রকম!'

ছেলেটা খানিকটা নুনের দানা তুলে নিয়ে চেটে দেখল। তারপর দোভাষীর মারফত সেরিওজাকে জানাল:

'বরফ নুনের মতো। নুনের মতোই নোনতা।'

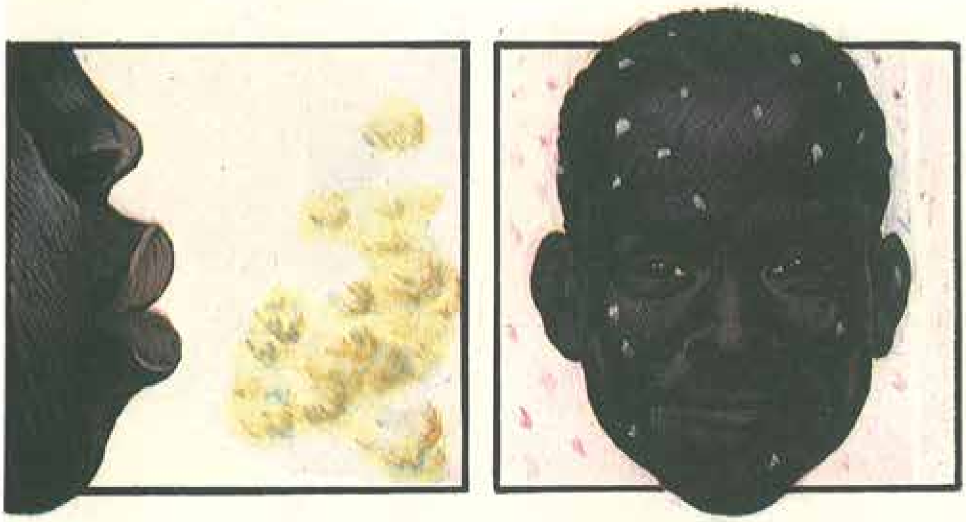
সেরিওজা তখন চিনির দানা নিয়ে পরীক্ষা করতে গেল। ছেলেটা চিনির দানা চেটে দোভাষীর মারফত জানাল যে এখন সে জানে বরফ কিসের মতন — বরফ আসলে চিনির মতন — ঐরকমই চমৎকার, মিষ্টি।

সে বিশ্বাস করতে পারল না। এই গতকালও আর্তেকে যেখানে যত সবুজ ছিল সব হঠাৎ সাদা ধবধবে হয়ে গেছে।

'হুর্‌রে!' সে চেঁচিয়ে বলল, 'আর্তেকে শীত এসে গেছে।'

'কিসের শীত!' তার ঘরের সঙ্গী বলল। 'এক মিনিটের মধ্যে সব গলে যাবে।'

'আচ্ছা, এই কথা!' সেরিওজা চটপট জামাকাপড় পরে নিয়ে শোবার ঘর থেকে ছুটে



তখন সেরিওজা কোথা থেকে যেন এক মুঠো কিসের রোঁয়া নিয়ে এলো।

মারিয়ানকে সে বলল, 'এই দেখ মারিয়ান, বরফ কিসের মতন!'

'বুঝতে পেরেছি,' দোভাষীর মারফত সে জানাল, 'বরফ রোঁয়ার মতন — ঐ রকমই নরম আর ফুরফুরে।'

ছোট্ট মারিয়ান কিছুতেই আর বুঝতে পারে না বরফ আসলে কী।

একদিন সকালে সেরিওজার ঘুম ভেঙে যেতে সে যা দৃশ্য দেখতে পেল তাতে নিজের চোখকে

বেরিয়ে গেল। দুমুঠো বরফ চেঁছে তুলে নিয়ে ছুটল মারিয়ানকে ডেকে তুলতে।

'এই মারিয়ান, উঠে পড়! আমি তোর জন্যে বরফ নিয়ে এসেছি!' সে চেঁচিয়ে বলল।

মারিয়ানের ঘুম ভেঙে গেল। সে কৌতূহলভরে এক দৃষ্টিতে সেরিওজার হাতের সাদা স্তূপটার দিকে তাকিয়ে রইল।

'তু-লো...' অতি কষ্টে সে উচ্চারণ করল।

'তুলো নয়, বরফ!' সেরিওজা ওকে চেঁচিয়ে বলল। 'আচ্ছা এই বারে খেয়ে দ্যাখ!'

ছেলেটা খেয়ে দেখল, তারপর জানলার





দিকে তাকাতে তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। শেষকালে তাহলে সতিকারের বরফ সে কাছ থেকে দেখতে পেল, এমন কি মুখে দিয়েও দেখল।

এবারে সে দোভাষীর মারফত সেরিওজাকে জানাল, 'বরফ আর কিছুর মতো নয় — বরফ বরফের মতোই।'

উপহার

আর্তেকে কেউ খালি হাতে আসে না। সকলেই ক্যাম্পে কিছু না কিছু উপহার নিয়ে আসে।

হাঙ্গেরির সেকেশফেহেরভার শহর থেকে কাতালিনা কোভাচ নামে একটা মেয়ে একটা পায়রা নিয়ে এসেছিল। সত্যিকারের পায়রা অবশ্য নয় — টিনের তৈরি। তোমরা প্রশ্ন করতে পার কাঠের কিংবা পেতলের বা অন্য কিছুর না হয়ে ঠিক টিনেরই হতে গেল কেন? টিনের হওয়ার কারণ এই যে মেয়েটি যে শহর থেকে এসেছে সেখানে টিন গলানোর একটা কারখানা আছে। কারখানার মজুরেরা যখন জানতে পারল যে কাতালিনা কোভাচ সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্তেকে পাইয়োনীয়র ক্যাম্পে যাচ্ছে, তখন তারা টিন থেকে ঢালাই করে একটা পায়রা বানাল। জিজ্ঞেস করবে, পায়রা কেন? সকলেই জানে যে পায়রা হল শান্তির দূত।

মজুরেরা কাতালিনাকে বলে দিয়েছিল পায়রাটা যেন আর্তেকে সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়, সবচেয়ে প্রিয় কাউকে উপহার দেয়। কিন্তু সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়, সবচেয়ে প্রিয় কাউকে খুঁজে বার করা কি চাট্টিখানি কথা? আর্তেকে সব লোকই যে ভালো! বড় ভালোমানুষ চমৎকার রাঁধুনি আন্দ্রেই

মাক্সিমভিচ, যার নাম সকলে দিয়েছে 'ঠেসে খাও'। তারপর দারুণ বুদ্ধিমতী লাইব্রেরিয়ান মহিলা লারিসা ভাসিলিয়েভ্না! তার সম্পর্কে ত গল্পই আছে।

এক বিদেশী ছেলে আর্তেকের সর্বত্র ঘোরাঘুরি ক'রে খুঁজে বেড়ায় 'বুক'। যারা ইংরেজী জানত তারা অনুবাদ ক'রে বলে 'বুক' মানে হল বই। সকলে ছেলেটাকে বই উপহার দিতে থাকে — রুশী, ইংরেজী, ফরাসী — কত ভাষায় কত রকমের যে বই! আর্তেকের যে পৃথিবীর সব জায়গার ছেলেমেয়েই আছে। কিন্তু বই সে নেয় না, কেবলই বলে সেই এক কথা — 'বুক'। ওকে তখন নিয়ে আসা হল লাইব্রেরীতে। বলা হল, এই আমাদের লাইব্রেরী, আর ইনি লারিসা ভাসিলিয়েভ্না — আমাদের লাইব্রেরিয়ান। ছেলেটা তাকে দেখেই 'বুক, বুক' বলে যা চিৎকারটা করে উঠল! এবারে বোঝা গেল কাকে তার দরকার।



আর 'সূয্যি' ভলোদিয়া? কারও চেয়ে কোন অংশে খারাপ নাকি? ভলোদিয়া ইলেকট্রিক মিস্ত্রী। ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে বাতি ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে, জিজ্ঞেস করে, 'সূয্যি-টুয্যিগুলো সব জ্বলছে ত?' 'জ্বলছে, জ্বলছে,' সকলে সমস্বরে উত্তরে দেয়। আর কোন 'সূয্যি-বাতি' যদি দেখা যায় জ্বলছে না তহলে ভলোদিয়া নতুন বাতি লাগিয়ে দেয়।

কিংবা বাহিনীর লীডার সুভেতা? কী হাসি-খুশি, আর সাহসই বা কত! তাছাড়া আবার হাঙ্গেরীয় ভাষাও জানে — কাতালিনার সঙ্গে তার মাতৃভাষায় কথা বলে।

তাই বলছিলাম কি, রাঁধুনি আন্দ্রেই মাক্সিমভিচ, লাইব্রেরিয়ান লারিসা ভাসিলিয়েভ্না, ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ভলোদিয়া আর বাহিনীর লীডার সুভেতা! — এই চারজনের মধ্যে তার উপহার পাওয়ার যোগ্যতা সবচেয়ে বেশি কার আছে?

কাতালিনা সমুদ্রের পারে বসে বসে ভাবে, শিগগিরই তার ক্যাম্পের মরসুম ফুরিয়ে আসছে, অথচ এখনও সে কোনমতে ঠিক করতে পারছে না পায়রাটা কাকে উপহার দেবে। সমুদ্র মৃদুস্বরে 'শ্-শ্-শ' করছে। কাতালিনা তার উত্তরে বলছে 'শ্-শ্-শ...' কেউ অমনি শুনলে ভাববে একটা মেয়ে সমুদ্রের সঙ্গে কানাকানি করছে, কিন্তু কী নিয়ে যে তাদের এত ফিসফিসানি সেটা বুঝতে পারবে না। আসলে কাতালিনা সমুদ্রের সঙ্গে পরামর্শ করছে কাকে ওটা উপহার দেওয়া যায়। এমন সময় তার কানে এলো:

'কাতালিনা, শুনছ?'

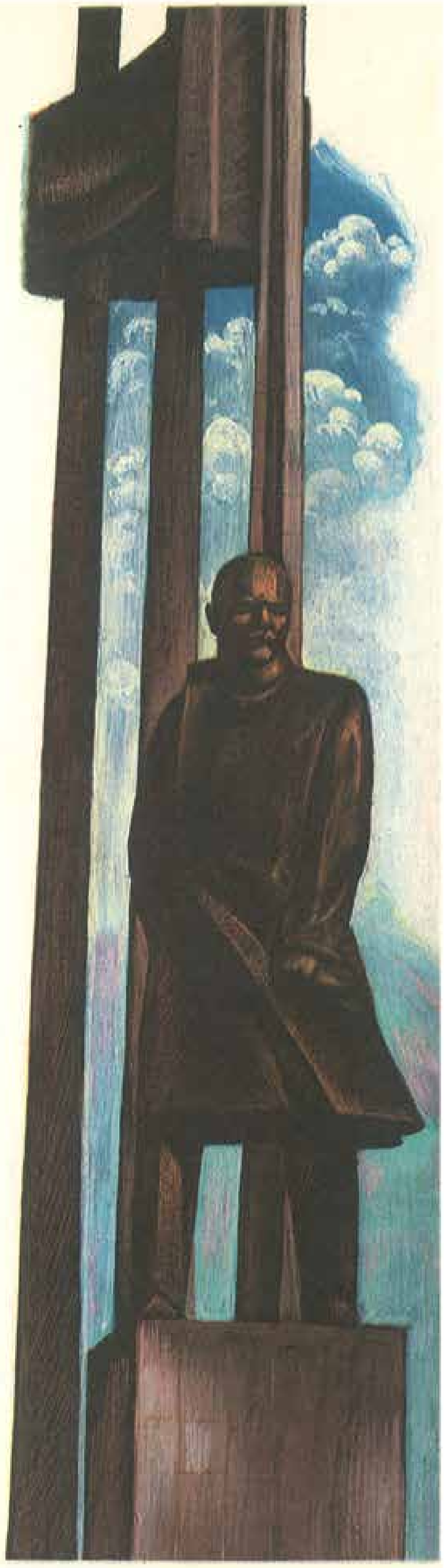
'এ কী! সমুদ্র কি মানুষের ভাষায় কথা

বলছে? না, বলছে স্ভেতা — ওদের লীডার। সমুদ্রের পারে এসেছিল, কাতালিনাকে দেখতে পেয়ে ডেকেছে। কাছে এসে সে তার পাশে বসল।

'কী নিয়ে অমন চিন্তা করছ?' স্ভেতা জিজ্ঞেস করল।

'ভাবছি পায়রাটার কথা — জানি না কাকে উপহার দেব,' এই বলে সে স্ভেতাকে পুরো বৃত্তান্ত বলল।

'বেশ ত,' স্ভেতা বলল, 'এসো, একসঙ্গে ভেবে দেখা যাক। আন্দ্রেই মাক্সিমভিচ দস্তুরমতো ভালো লোক। চমৎকার রান্না করে, আমাদের সাগর-ক্যাম্পের সব্বাই পেট ভরে তার রান্না খাবার খায়। কিন্তু কাতালিনা, তুমি জান কি, আমাদের দেশে এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি কোটি কোটি বুভুক্ষু মানুষের মুখের অন্ন যুগিয়েছেন, তাদের খালি পায়ে জুতো যুগিয়েছেন। ইলেকট্রিক মিস্ত্রী ভলোদিয়া — সেও দস্তুরমতো ভালো লোক, কিন্তু সে যে 'সূর্যি প্রদীপ' জ্বালায় তা শুধু তোমাকে, আর তোমার মতো এখানকার আরও ডজন কয়েক বাসিন্দাকে আলো দেয়। কিন্তু এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি আমাদের এই বিশাল দেশের সমস্তটা জুড়ে, সারা সোভিয়েত দেশ জুড়ে আলো জ্বালিয়ে দিয়ে যান। লারিসা ভাসিলিয়েভ্নাও ভালো লোক, কিন্তু উনি যে বই দেন তা পড়ে শুধু আমাদের ক্যাম্পে যারা আছে তারা। আর আমি যে-মানুষের কথা বলছি তিনি কোটি কোটি অশিক্ষিত লোককে লিখতে পড়তে শেখান। আমি একটা দল পরিচালনা করছি। কিন্তু আমি একজন গাইডমাত্র — অন্যদের পথ দেখাই। আমি তোমাকে, তোমার মতো আর ডজন দুয়েক ছেলেমেয়েকে চালাই, পথ দেখাই। কিন্তু ঐ মানুষটি ছিলেন নেতাদের নেতা।



তিনি ছিলেন আমাদের সমস্ত দেশের মহানেতা। তিনি সব মানুষকে সুখ-সমৃদ্ধির পথ দেখিয়েছিলেন। মনে রেখো কাতালিনা, আমাদের এই আর্তেকও সেই সুখেরই একটা অংশ, যে সুখ তাঁর অন্তিম নির্দেশমতো শিশুরা উপহার পেয়েছে। চল, আমার সঙ্গে চল। এবারে তুমি আর্তেকের সবচেয়ে প্রিয় মানুষটিকে দেখতে পাবে।

তারা পাহাড় বয়ে ওপরে ক্যাম্প ফায়ার জ্বালানোর চত্বরে গিয়ে উঠল।

সুভেতা আঙুল দিয়ে ওপরের দিকে দেখিয়ে বলল, 'ওই যে, তাকিয়ে দেখ।'

সেখানে, পাহাড়ের মাথার ওপর দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদে উদ্ভাসিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ভ্যাদিমির ইলিচ লেনিনের মূর্তি — ঠিক যেন একটা জ্যান্ত মানুষ!

একই নামের — কিন্তু নামজাদা

কখন কখন মা-বাবা, দাদু কিংবা দিদিমা তাদের প্রিয় নায়ক, প্রিয় লেখক, অভিনেতা বা পর্যটনকারীর নামে ছোটদের নামকরণ করে থাকেন। আর্তেকে একটা ছোট ছেলে এসেছিল — তার দাদু তাঁর যুদ্ধের জনৈক সঙ্গীর স্মৃতিতে নাতির নাম রেখেছিলেন তিমুর। দাদু বহুকাল হল গত হয়েছেন — তিমুরের ভালোমতো মনেও নেই তার দাদু কোন বন্ধুর কাহিনী তাকে বলেছিলেন।

একবার সকালের খাবারের পরে বিউগল পদযাত্রায় বেরিয়ে পড়ার বাজনা বাজিয়ে দলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে চলল আর্তেকের ওপর দিয়ে। সমুদ্রের পার ধরে চলতে চলতে পরে ওপরে উঠে গিয়ে শেষকালে সকলে একটা ছোটখাটো চত্বরের ওপর এসে পড়ল। চত্বরটা ঘিরে শান্ত্রীর মতো দাঁড়িয়ে আছে দক্ষিণ অঞ্চলের সুন্দর সুন্দর গাছ — প্লেইন গাছ ও সাইপ্রেস গাছ। কিন্তু সকলের মনোযোগ যার ওপর গিয়ে পড়ল তা গাছপালা নয় — চাঞ্চল্যকর অন্য কোন জিনিস। চত্বরের মাঝখানে একটা ফুলের কেয়ারি, আর তার মাঝখানে লাল টকটকে ফুলের রাশির মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ভালুক-পাহাড় থেকে বয়ে আনা একটা পাথরের চাঁই। একটা শ্বেত পাথরের ফলকের গায়ে লেখা আছে: 'এরা ছিল আর্তেকের ক্যাম্পার'। একটা নাম দেখতে পেয়ে তিমুরের বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল — 'তিমুর ফ্রুঞ্জে'। আচ্ছা এই নামজাদা লোকটার নামে তার নামকরণ করা হয় নি ত? মনে মনে ভাবল শোনা যাক তাদের বাহিনীর লীডার কী বলে।

বাহিনীর লীডার বলল, 'তিমুর ফ্রুঞ্জে যাঁর ছেলে তাঁকে তোমরা সকলেই জান। তিনি হলেন গৃহযুদ্ধের প্রবাদ-পুরুষ, বিখ্যাত সেনানায়ক মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ ফ্রুঞ্জে।

১৯১৭ সালের অক্টোবরে রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকেরা জমিদার ও পুঁজিপতিদের শাসনক্ষমতা উৎখাত করল — অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব সংঘটিত হল। কিন্তু প্রাক্তন মালিকেরা তাদের জমি ও কলকারখানা

হারানোর ঘটনা মেনে নিতে নারাজ। তারা বিপ্লবকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিল। তাই দেশে বেধে গেল গৃহযুদ্ধ। বিপ্লবের ফলে যা যা অর্জিত হয়েছে তাকে রক্ষা করার সংকল্প নিয়ে শ্রমিক ও কৃষকেরা গড়ে তুলল লাল ফৌজ। এই লাল ফৌজেরই একজন কম্যাণ্ডার ছিলেন মিখাইল ভাসিলিয়েভিচ ফ্রুঞ্জে।

'তিমুর ফ্রুঞ্জে যখন খুব ছোট তখন তার মা-বাবা মারা যান। তিনি আর তাঁর বোন একসঙ্গে মানুষ হন লাল ফৌজের আরেকজন প্রবাদ-পুরুষ, বিখ্যাত সেনানায়ক ক্লিমেন্ত এফ্রেমভিচ ভরশিলভের পরিবারে।

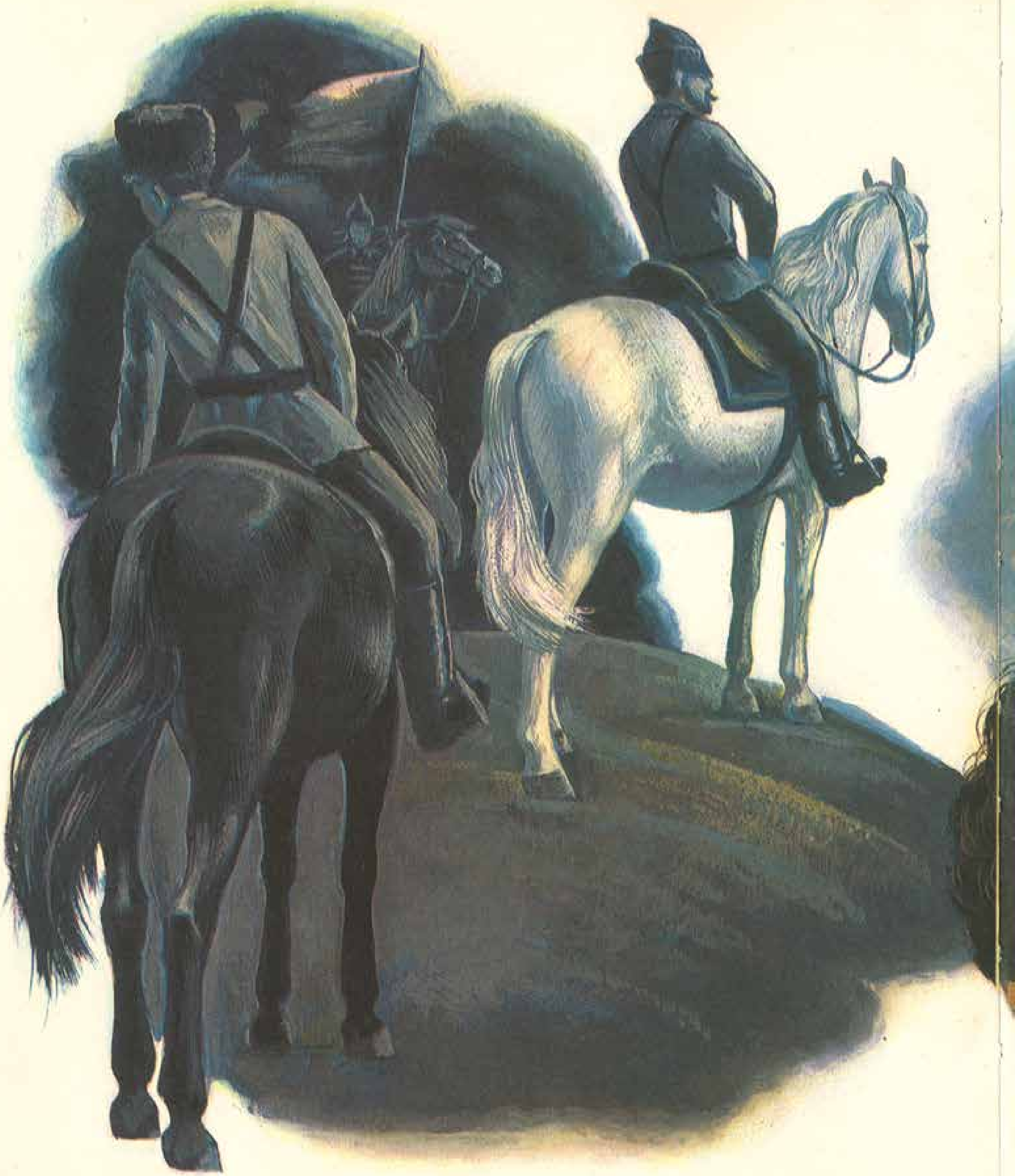
'১৯৩৫ সালের গ্রীষ্মকালে কিশোর তিমুর আর্তেকে এসেছিল। আর্তেকে থাকার সময় সে ছেলেমেয়েদের সত্যিকারের নেতা হিসাবে নিজের পরিচয় দেয়। তিমুরের সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল বিমানবিদ্যা। তাঁর ছেলেবেলার বীরপুরুষ ছিলেন চ্কালভ, গ্রমোভ, কোক্কিনাকি — তখনকার কালের সমস্ত বিখ্যাত সোভিয়েত বৈমানিক।'

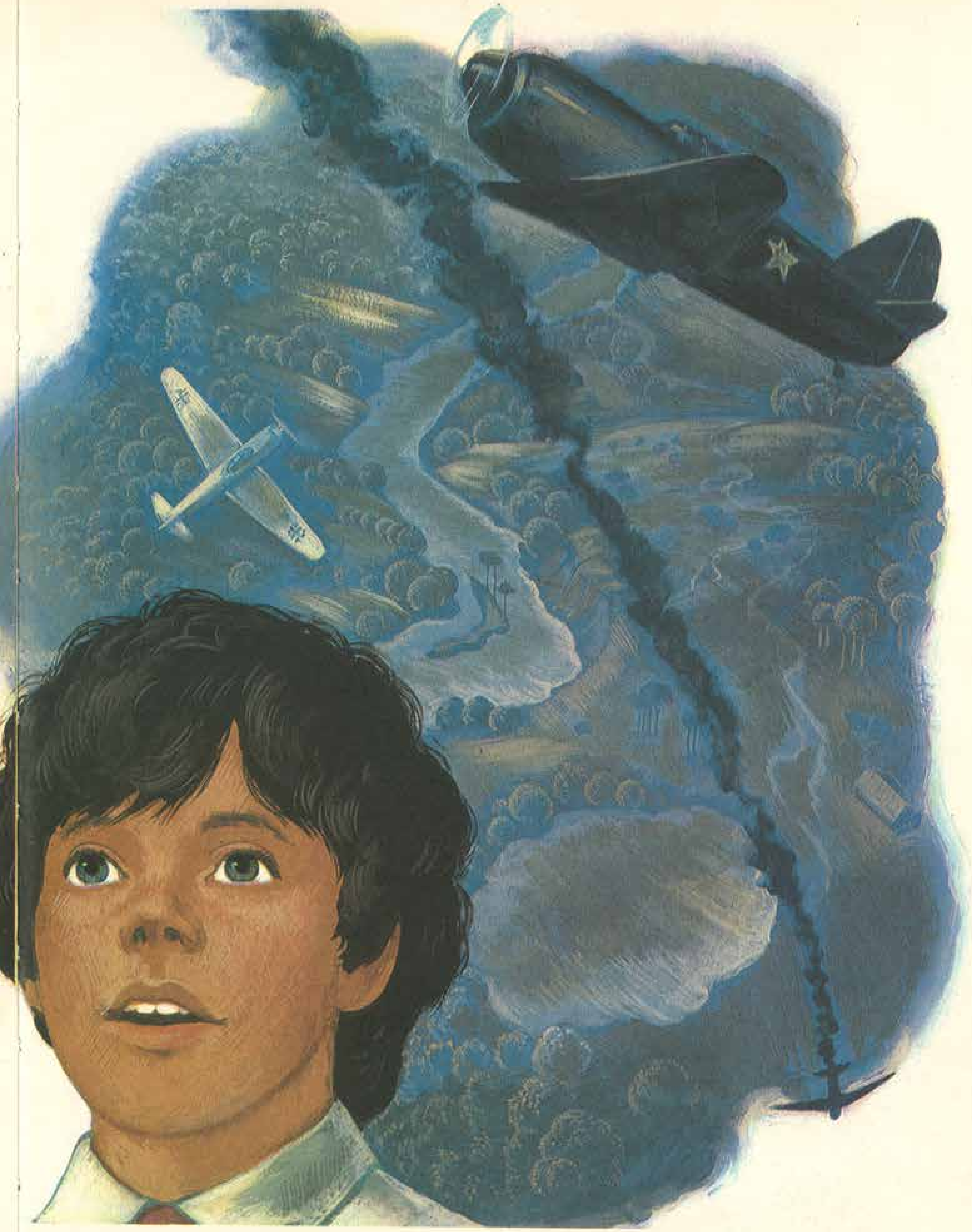
১৯৩৭ সালে বৈমানিক ভালেরি চ্কালভ, মিখাইল গ্রমোভ ও ভ্লাদিমির কোক্কিনাকি দুই মহাদেশে বীরের অভ্যর্থনা লাভ করেন। এতে আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ নেই। সেই সময়ের পক্ষে উত্তর মেরুর ওপর দিয়ে সোভিয়েত বৈমানিকদের বিরতিহীন মস্কো — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিমানচালনা একটা কীর্তি বৈ কি!

'তিমুর ফ্রুঞ্জে বৈমানিক হলেন। বিমানবিদ্যায় তাঁর পরিণতির পরীক্ষা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। তিনি যখন প্রথম শত্রুপক্ষের বিমান ঘায়েল করা শুরু করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো।

'ঘটনাটা ঘটে ১৯৪১ সালের ১৯ জানুয়ারী তারিখে, স্তারায়া রুস্সা এলাকায়। তিমুর তাঁর ফাইটার নিয়ে শত্রুপক্ষের বোমারু বিমানের মুখোমুখি হলেন। তুমুল ও নির্মম সেই সংঘর্ষ। নাৎসীদের প্লেন ছিল সংখ্যায় আটটা। সোভিয়েত পক্ষে — মাত্র দুটো — একটা তিমুরের, অন্যটা পাইলট শুতভের। তিনিও তাঁর সঙ্গে সমানে সমানে যান। একটা মেস্সেরস্মিট ঘায়েল হল, আরেকটা ঘায়েল হল — কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা থেকে যেন শত্রুপক্ষের ফাইটার বিমান এসে হানা দিল তিমুর ফ্রুঞ্জের প্লেনের ওপর। তিমুর বীরের মৃত্যু বরণ করলেন — শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন, শত্রুর কাছে পিছু হটলেন না। তিমুর তাঁর দেশের শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত হন — তিনি মরণোত্তর সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাব অর্জন করেন।'

স্তারায়া রুস্সা! তিমুর সরোকিনের আবছা আবছা মনে পড়ল এ নামটা যেন সে শুনেছে। কবে, কার কাছে? দাদুর কাছে! সে যখন ছোট তখন দাদু তাকে যুদ্ধের ঘটনা বলতে বলতে প্রায়ই স্তারায়া রুস্সার নাম করতেন। দাদু ছিলেন ফ্রন্টের বৈমানিক। তিনি স্তারায়া রুস্সার আকাশে যুদ্ধ করেন। তিমুর ফ্রুঞ্জেও ছিলেন ফ্রন্টের বৈমানিক। তিনিও স্তারায়া রুস্সাতেই যুদ্ধ করেন। তাহলে ত বোঝাই যাচ্ছে কার নামে দাদু ওর নাম তিমুর রেখেছিলেন!






1937

কিরণ আর দেশলাই

সব ছোট ছেলেমেয়েই ধুনি জ্বালিয়ে তার পাশে বসে শরীর গরম করতে ভালোবাসে। ভানিয়া নিকিতিনও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই আর্তেকে আসামাত্রই সে ছুটল ক্যাম্প ফায়ারের চত্বরের খোঁজে।

জায়গাটা খুঁজে বার করার পর সে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করতেই পারল না যে এই সেই ধুনি জ্বালানোর জায়গা। চত্বরটা দেখতে অনেকটা স্টেডিয়ামের মতো — স্টেডিয়ামের মতোই থরে থরে উঠে গেছে গ্যালারি। একমাত্র তফাত এই যে স্টেডিয়ামের 'মাঠটা' যেন সাধারণ মাঠের চেয়ে ছোট। কিন্তু এই মাঠের ওপরই আনন্দ আর উৎসবের দিনে আগুন জ্বালানো হয়।

চত্বরের মাঝখানে পিরামিডের আকারে সাজানো ছিল শুকনো ডালপালা। তার খানিকটা দূরে উবু হয়ে বসে দুটি ছেলে কী যেন করছিল। তাদের একজনের চুলের রঙ শণের মতো, আরেক জনের — কালো।

'এটা ক্যাম্প ফায়ার বুঝি?' ভানিয়া ছেলেদুটোকে জিজ্ঞেস করল।

'ক্যাম্প ফায়ার হবে,' ওদের একজন উত্তরে বলল। 'তুমি এখানে নতুন নাকি?'

'হ্যাঁ,' মাথা নেড়ে বলল ভানিয়া।

'এই ত তোমরা যারা নতুন এসেছ তাদের জন্যেই এই ধুনি জ্বালানো হবে।'

'তোমরা কি পাহারাদার নাকি?' ভানিয়া জিজ্ঞেস করল।

'কিসের পাহারাদার?' কালোচুল ত অবাক।

'ক্যাম্প ফায়ারের পাহারাদার,' ভানিয়া বলল।

ওরা দুজনেই হেসে ফেলল।

'আমাদের আর্তেকে পাহারার ব্যবস্থা নেই। আমাদের এখানে সব খোলা, সব দরজা খোলা। পাহারা দেব কী করতে? নিজেরাই নিজেদের পাহারা দেব নাকি? আর্তেক যে আমাদের!'

'তাহলে তোমরা কী করছ?' ভানিয়া জিজ্ঞেস করল।

'আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছি। এই যে দেখতে পাচ্ছ এই আতস কাচটা?'

'দেখতে পাচ্ছি,' এই বলে ছেলেটার হাতে যে আতস কাচটা ধরা ছিল ভানিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে রইল।

'ওর ভেতরে সূর্যের কিরণ পাকড়াও করে তা দিয়ে এক টুকরো কাগজ জ্বালাব,' কালোচুল বলল, 'আর কাগজ থেকে জ্বালাব মশাল — ঐ যে দেখতে পাচ্ছ? মশাল থেকে জ্বালাব ক্যাম্প ফায়ার... তাহলে ক্যাম্প ফায়ারটা হবে সূর্যের কিরণ থেকে — বুঝলে ত?'

ভানিয়া হতভম্ব হয়ে কাঁধ ঝাঁকাল।

'সূর্য থেকে কেন? কী দরকার? এত খাটার কী আছে? তার চেয়ে দেশলাই জ্বালালেই ত হয়। এই যে আমার আছে,' এই বলে সে ওদের দিকে দেশলাইয়ের বাক্স বাড়িয়ে দিল।

'দেশলাইয়ের আগুনে চলবে না,' একজন বলল।

'সেটা প্রতীক ধরনের হবে না,' অন্যজন যোগ করল।

'আমাদের জীবনই এসেছে সূর্য থেকে,' প্রথমজন বলল।

'আমাদের ক্যাম্প ফায়ারও তাই। এবারে বুঝলে ত?' দ্বিতীয়জন বলল।

'হ্যাঁ এবারে বুঝেছি,' ভানিয়া দেশলাই লুকিয়ে ফেলে বলল। 'আমি তোমাদের কাজে লাগতে পারি কি?'

'তা যদি চাও তবে এই যে এই মশালটা ধর,' শণচুল ছেলেটা বলল। হঠাৎ সমুদ্র থেকে হাওয়া বইতে শুরু করলে পিঠ দিয়ে হাওয়া আড়াল করে সে আতস কাচ দিয়ে সূর্যকিরণ ধরতে লেগে গেল।

দেখা হয়ে গেল

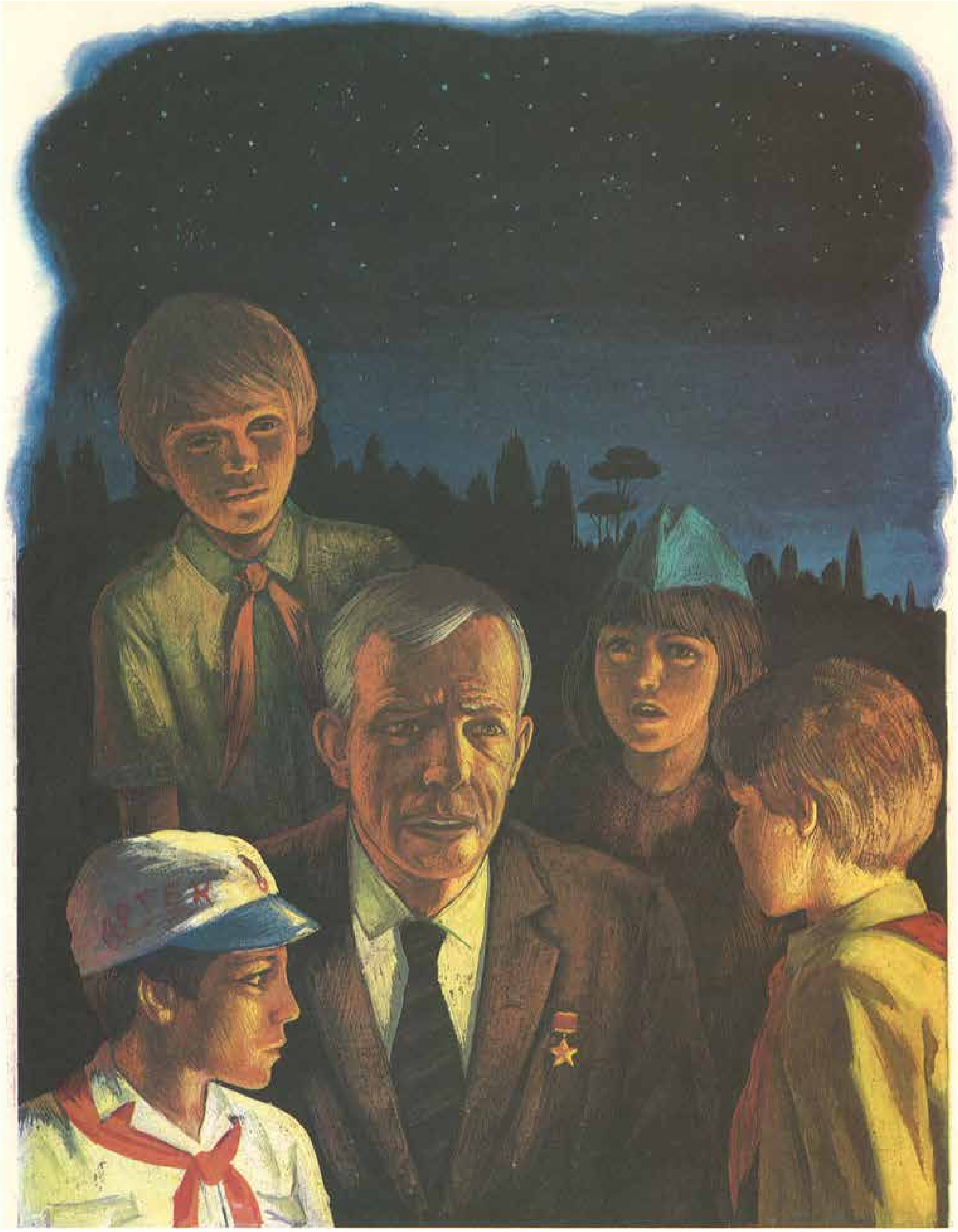
সমুদ্রের দিক থেকে রামধনুর সাতরঙের বাহার খেলিয়ে ঝলমল করে ওঠে আর্তেক। কিন্তু আজ সব রঙের মধ্যে যে রঙটির প্রাধান্য তা হল ঘন লাল। এই শিশুরাজ্যের গোটা উপকূল ধরে জ্বলছে উৎসবের আগুন — বিজয় উপলক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন। অজানা নাবিকের সমাধির সামনে যে অমর জ্যোতি আছে সেখান থেকে জ্বালানো হয়েছে এই সব অগ্নিকুণ্ড। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত দেশের বিজয়ের সম্মানে এগুলো জ্বলছে।

সোভিয়েত দেশের লোকেরা যে-সমস্ত উৎসব পালন করে সেগুলোর মধ্যে বিজয় দিবস বিশেষ উল্লেখ করার মতো। এই দিনটা যেমন শোকের, তেমনি আবার আনন্দেরও। শোকের এই জন্যে যে এই দিন, ৯ মে তারিখে সোভিয়েত দেশের সর্বত্র লোকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের স্মৃতির উদ্দেশে এক মিনিটের নীরবতা পালন ক'রে শ্রদ্ধা জানায়। আর আনন্দের, এই কারণে যে ১৯৪৫ সালের ৯ মে ভয়াবহ যুদ্ধশেষের দিন, নাৎসীদের বিরুদ্ধে বিজয়ের দিন। এই দিন ইউরোপ নাৎসী সন্ত্রাস থেকে মুক্ত হয়েছিল। এই দিনটিতে সোভিয়েত দেশের লোকেরা আরও একবার জোর গলায় বলে থাকে: 'যুদ্ধ চাই না!'

আকাশে উঠছে রঙবেরঙের বিরাট বিরাট বেলুন। এগুলো সাধারণ বেলুন নয় — এরা ডাক বয়ে নিয়ে যায়। অমনি অমনি এই বেলুনগুলো আর্তেকের মেঘমুক্ত রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে ভেসে বেড়ায় না — বয়ে নিয়ে যায় অদ্ভুত ঠিকানা লেখা নানা চিঠি — বিশ্বের মানুষের কাছে আর্তেকের ছেলেমেয়েদের লেখা চিঠি। চিঠিগুলোতে আছে ফ্যাসীবাদ আর যুদ্ধের বিরুদ্ধে, শান্তির জন্য সংগ্রামের আবেদন।

সমুদ্রের বুকে বেরিয়ে পড়ে লঞ্চ। লঞ্চগুলোতে আছে পৃথিবীর সব দেশের ছেলেমেয়ে, তাদের সবার গায়ের চামড়া আর চুলের রঙ এক নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে-সব সোভিয়েত নাবিক প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে তারা বয়ে নিয়ে চলেছে ফুলের মালা। এই ফুলের মালাগুলো এখন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে সমুদ্রে, সমুদ্রের ঢেউ সেগুলোকে বয়ে নিয়ে যাবে পৃথিবীর নানা দেশের সাগরপারে।

ওলিয়া গলভানভা মস্কো থেকে আর্তেকে



এসেছে। যে-সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তাদের স্কুলের মিতালি আছে, ওলিয়ার আশা ছিল আর্তেকে সে তাদের দেখা পাবে। ব্যাপারটা এই যে তাদের মস্কোর স্কুল আর বার্লিনের একটা স্কুল 'বিজয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য' উৎসবের উদ্যোক্তা ছিল। এই দুই স্কুল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সমস্ত ছেলেমেয়েদের কাছে শোকানুষ্ঠান আর নানা রকম বিচিত্রানুষ্ঠান দিয়ে ফ্যাসীবাদ ধ্বংসের তিরিশ বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপনের আবেদন জানায়, আর এই ঘটনা উপলক্ষে প্রধান উৎসব তারা প্রস্তাব দেয় আর্তেকে উদ্‌যাপন করার।

এখন ওলিয়া আর্তেকে — বারো-তেরো চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছেলেমেয়েদের বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে একটা ছোট্ট মানুষ, ছোট্ট একটা জলবিন্দু।

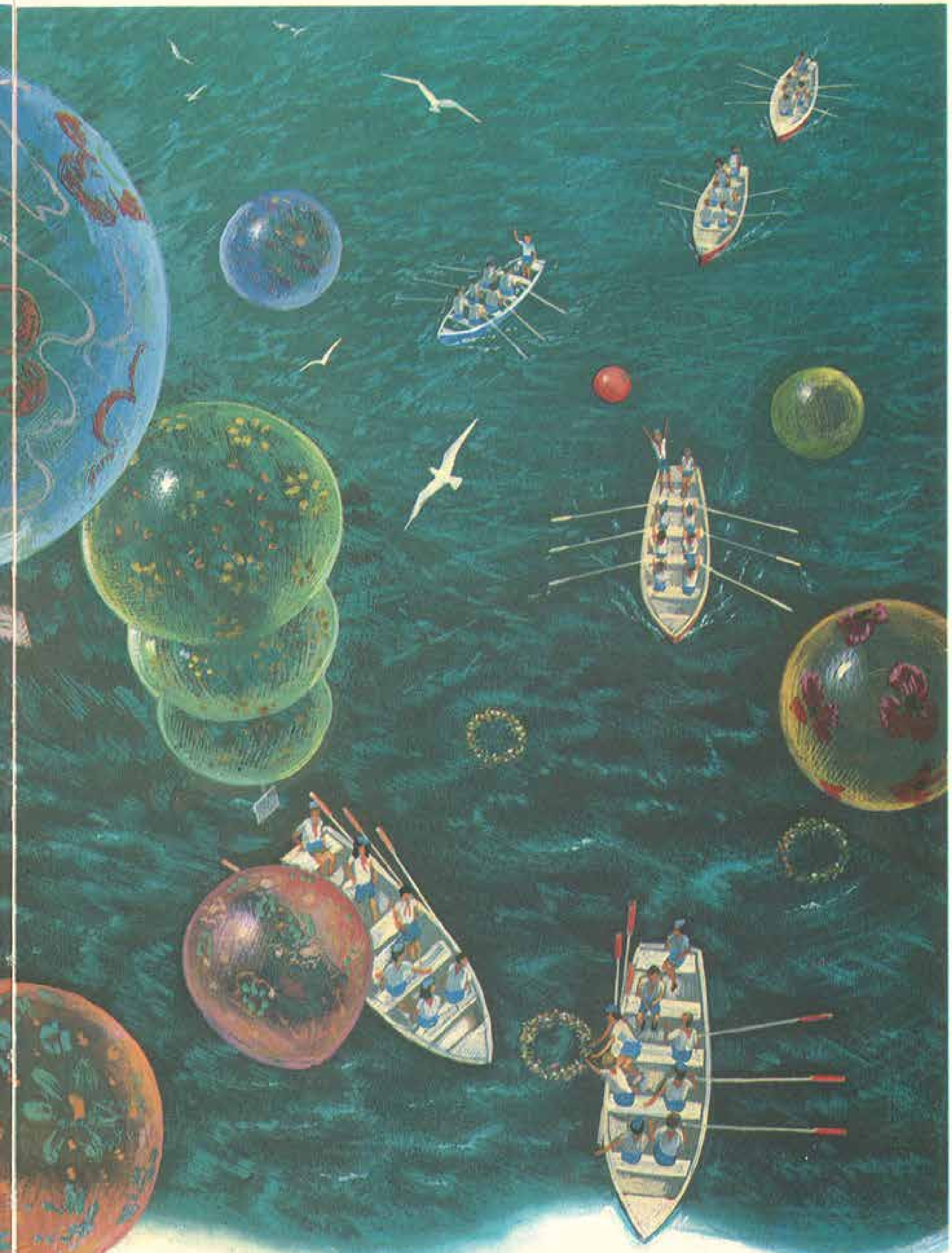
ওর মনে পড়ল, মস্কো ছাড়ার সময় স্কুলের বন্ধুরা তাকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিল, 'গান শুনে খুঁজে বার করার চেষ্টা করিস। আমাদের একই গান। তাই শুনে বার করতে পারবি।'

কিন্তু কি করে খুঁজবে? বলা নেই কওয়া নেই উঠে দাঁড়িয়ে গান গাইতে শুরু করবে? তাহলে ত সকলে হাসবে! সে ঠিক করল ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে গুন গুন করে গান গাইবে। গাইতে শুরু করেছে কি করে নি, অমনি শুনতে পেল পরিচিত গানের সুর। একটা গোল মুখ ছেলে এতটুকু সঙ্কোচ না করে জোর গলায় গান ধরেছে:

'ছোট জলধারা থেকে
শুরু হয় নদী...'

কিন্তু না, এই ছেলেটা জার্মান হতে পারে না। এ রুশী। ছেলেটার পাশ দিয়ে কয়েক পা হেঁটে চলে যাবার পর হঠাৎ সে পেছনে শুনতে





পেল কে যেন ভাঙা ভাঙা রুশীতে ঐ গানটাই গাইছে। ফিরে তাকাতে দেখতে পেল যে-ছেলেটা গাইছিল তার পাশে আর্তেকের নীল রঙের ইউনিফর্ম পরে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে — গায়কের মুখের ওপর থেকে সে তার খুশিতে উপচে পড়া দৃষ্টি আর সরাতে পারছে না। তারপর গান গাওয়া শেষ হয়ে গেলে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল সে মস্কো থেকে কিনা।

'না,' উত্তরে ছেলেটি বলল, 'আমি কস্ত্রমা থেকে।'

'আমি, আমি মস্কো থেকে,' ওলিয়া ছুটে এলো। 'তুমি কি বার্লিন থেকে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বার্লিন থেকে!' মেয়েটির খুশি আর ধরে না।

এই ভাবে 'বিজয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য' উৎসবের দুই উদ্যোক্তা মস্কোর ওলিয়া গলভানভা আর বার্লিনের জানি মার্টেনের দেখা হয়ে গেল।

যে তিরিশ দিন ওদের এই ক্যাম্প চালু থাকে তার মধ্যে একদিন ওরা একে অন্যের সঙ্গ ছাড়ে নি। 'যুদ্ধ চাই না!' — আর্তেকের স্টেডিয়ামে সমস্ত দেশের সমবেত ছেলেমেয়েরা যখন 'বিজয়ের শ্রদ্ধার্ঘ্য' উৎসবের এই মূল বাণী সমস্বরে উচ্চারণ করল তখন তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ওরাও তা-ই বলল।



সবচেয়ে বড় জিনিস

আর্তেকে ফরাসী দেশের যত ছেলেমেয়ে আছে তাদের মধ্যে সবার চেয়ে ছোট সিমোনা পান্তুর নামে একটি মেয়ে। সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে ডানপিটে। সকলের চেয়ে ছটফটে, সকলের চেয়ে তার কৌতূহলও বেশি। একবার সিনেমায় তুষারিকা সম্পর্কে একটা রূপশী রূপকথা দেখতে পেল। সেখানে তুষারিকা বসন্তকালে বনের ভেতরে জ্বালানো অগ্নি-কুণ্ডের ওপর দিয়ে কী লাফই না দিয়েছিল! মেয়েটির সাধ হল সেও তুষারিকা হয়। অন্যদের বলে কয়ে আগুন জ্বালাতে রাজি করাল। ক্যাম্প ফায়ার জ্বলে উঠল।

'লাফ দাও! লাফ দাও!..' সিমোনা চিৎকার করতে লাগল।

কিন্তু কেউ লাফায় না, সবাই ভয় পায়। তখন সিমোনা দৌড় শুরু করল, সে-ই প্রথম ধুনির ওপর দিয়ে লাফাল। তার পেছন পেছন — অন্যেরা। সেই মুহূর্তে পাইয়োনীয়র বাহিনীর লীডার জোইয়া ছুটে এসে ওদের থামাল। ছেলেমেয়েদের কাছে মজা, কিন্তু তার পক্ষে এটা বিপদের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে যদি হঠাৎ ওদের কারও গায়ে আগুন লেগে যায়। ওদের সকলের মধ্যে সবচেয়ে ছটফটে হল সিমোনা। এক মুহূর্তের জন্যও সে বসে থাকে না, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না — কখনও বানরের মতো তরতর করে ইয়া উঁচু সাইপ্রেস গাছের আগায় গিয়ে উঠে বসছে, কখনও বা সমুদ্রে ডলফিনের মতো সাঁতরে সবার আগে আগে চলে যাচ্ছে।

সিমোনা শুধু যে সাহসী আর উৎসাহী তা-ই নয় — তার কৌতূহলেরও শেষ নেই। একবার সে পাইয়োনীয়র বাহিনীর লীডার জোইয়াকে জিজ্ঞেস করল ইণ্টারন্যাশনাল অর্থ কী। আর্তেকের বেশ কিছু পোস্টারে সে একাধিকবার এই শব্দটি পেয়েছে।

জোইয়া সবই জানে। সেইজন্যই ত সে আর্তেকের ছেলেমেয়েদের পাইয়োনীয়র বাহিনীর লীডার। তার কাজই হল সব জানা এবং ধুনি জ্বালানো, ধুনির আগুনে আলু পোড়ানো, জটিল গিঁট বাধা, মাছ ধরা, নানা রকম খেলাধুলো, এমন কি এটা-ওটা খেলনা তৈরির কাজ — যা যা সে জানে, ছেলেমেয়েদের শেখানো। আচমকা কারও যদি নাক ভেঙে যায় বা সে রকম কোন দরকার পড়ে তাহলে সে প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, ইণ্টারন্যাশনাল যে কী তা জোইয়ার জানা আছে। তাই সে উত্তরে সিমোনাকে বলল:

'ইণ্টার' অর্থ ভেতরে, আর 'ন্যাশনাল' — জাতীয়। তাই ইণ্টারন্যাশনাল কথাটার অর্থ হল আন্তর্জাতিক — কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য নিয়ে নানা জাতির লোকে যখন একসঙ্গে মেলে তখন তাকে বলা হয় ইণ্টারন্যাশনাল বা আন্তর্জাতিক। বুঝলে?'

'বুঝেছি, বুঝেছি,' সিমোনা উল্লসিত হয়ে বলল। 'তাহলে আমাদের আর্তেকও ইণ্টারন্যাশনাল!'

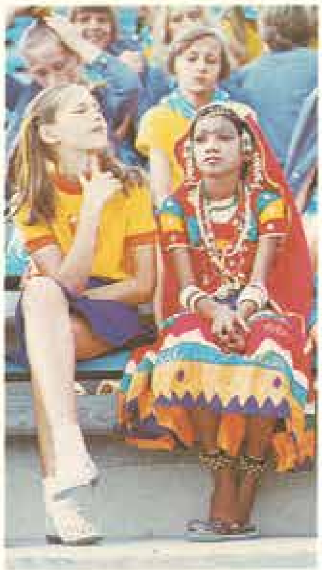
'অবশ্যই,' জোইয়া সমর্থন জানিয়ে বলল, তার কারণ এই যে আর্তেকে বহু দেশের ছেলেমেয়েরা বিশ্রামের সময় একসঙ্গে এসে জোটে। আর আর্তেকের কাজ যে আরও কী সেটা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পার?'

'তা আর পারি না!' সিমোনা বলল।





সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত জায়গা এবং পৃথিবীর বহু দেশ থেকে ছেলেমেয়েরা আর্তেকে আসে।



এখানে আসার পর তারা এক বিরাট আন্তর্জাতিক পরিবারভুক্ত শিশুতে পরিণত হয়।



















'ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য আর সুখ দান করাই ত আর্তেকের কাজ!'

'শুধু তা কেন হতে যাবে? আর্তেকের আরও একটা উদ্দেশ্য আছে — সেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সবচেয়ে বড়।'

'কী সেটা?' সিমোনা জিজ্ঞেস করল।

'এখুনি জানতে পারব,' জোইয়া বলল। 'ওই যে ওখানে, ক্যাম্প ফায়ারের চত্বরে, দেখতে পাচ্ছ ছেলেমেয়েরা বেলুন ওড়াচ্ছে? চল, ওখানে যাওয়া যাক।'

ওরা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেল মাটিতে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। তার ওপরে দড়ি-দড়া দিয়ে একটা বেলুন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ওটাকে বলা হয় ফানুস। ফানুস আগুন থেকে গরম হাওয়া নিয়ে তার ঠেলায় আকাশে উড়বে। ফানুসটা কাগজের, তার গায়ে নানান ভাষায় লেখা আছে 'আমরা শান্তির পক্ষে', নীচে বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েরা তাদের নাম সই করেছে। 'আমি সই করতে পারি?' সিমোনা জিজ্ঞেস করল।

'পারবে না কেন?' এই বলে জোইয়া সিমোনাকে একটা লাল পেন্সিল দিল।

ছোট্ট ফরাসী মেয়েটা লাল পেন্সিল দিয়ে নাম লিখল — 'সিমোনা পাস্তুর'। ছেলেমেয়েরা, যে দড়ির বাঁধনে ফানুসটা হাতে ধরে রেখেছিল এবারে তা ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ফানুস আকাশে উড়ে গেল — পৃথিবীর সমস্ত মানুষের কাছে যে বার্তা নিয়ে চলল তা এই যে আর্তেকের সকলে — রুশী, ইংরেজ, ফরাসী জার্মান, পোল, হাঙ্গেরীয় — সবাই শান্তির পক্ষে।

ফানুস যখন উড়ে গেল তখন সিমোনাকে জোইয়া জিজ্ঞেস করল সব দেশের ছেলেমেয়েদের আন্তর্জাতিক মৈত্রীর সবচেয়ে বড় কথা কী বলে তার মনে হয়?

নীল আকাশে ফানুসের ওড়া লক্ষ করতে করতে সিমোনা চটপট উত্তর দিল, 'শান্তির জন্যে কাজ করা।'

কসরৎ

সমুদ্রের ওপর দিয়ে একটা মোটর বোট যাচ্ছিল। সেটাকে দেখাচ্ছিল একটা আইসবার্গের মতো। ভাসিয়া আন্দ্রেইয়েভ তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। মোটর বোটটা ধীরে ধীরে ভাসতে ভাসতে এক সময় দিগন্তের ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ভাসিয়া আন্দ্রেইয়েভ পিছু ফিরে তাকাতে দেখতে পেল একটা উঁচু গাছ। 'আচ্ছা, গাছটার ওপরে উঠলে ত দিগন্তের ওপারটা দেখা যেতে পারে!' সে মনে মনে ভাবল। সঙ্গে সঙ্গে সে গাছে চড়ে বসল, এবারে আবার দেখতে পেল মোটর বোটটা। কিন্তু এমন সময় কে যেন তার নাম ধরে ডেকে বলল:

'ভাসিয়া আন্দ্রেইয়েভকে পাইয়োনীয়র রুমে যেতে বলা হচ্ছে।'

ভাসিয়া আশ্চর্য হয়ে গেল। তাহলে কি আর্তেকে গাছে চড়া বারণ? সে কি গাছে চড়ে অন্যায় করেছে? কেউ হয়ত দেখে ফেলেছে, তাই এখন ভাসিয়ার ডাক পড়েছে! শুনতে পায় নি এমন ভান করে না গেলে কেমন হয়? না,

সেটা একজন পাইয়োনীয়র সদস্যের উপযুক্ত কাজ হবে না। তার চেয়ে গিয়ে কবুল করাই ভালো। ও এখানে নতুন এসেছে, এখানকার হালচাল এখনও ওর ভালো জানা নেই। তাই ত মোটর বোটটা আরও একবার দেখার জন্যে গাছের ওপর চড়ে বসেছিল।

ভাসিয়া গাছ থেকে নেমে পাইয়োনীয়র রুমের দিকে ছুটল। ঘরে ঢুকে সে সাহস দেখিয়ে বলল:

'আমিই গাছে চড়েছিলাম।'

'বেশ, তারপর?' ওদের বাহিনীর লীডার ইগর জিজ্ঞেস করল।

'তারপর আবার কী?' ভাসিয়া প্রশ্নটা ধরতে পারল না।

'জিজ্ঞেস করছিলাম, ভালোয়-ভালোয় কাজটা সারতে পেয়েছিলে ত? কিছু ছেঁড়-টেঁড় নি ত?'

ভাসিয়া নিজের গা-হাত-পা স্পর্শ করে দেখল, তারপর মনে মনে বেশ মজা পেয়ে হেসে ফেলল।

'কিচ্ছু ছিঁড়ি-টিঁড়ি নি, সব আস্ত আছে,' সে বলল। ওকে যে বকা দেওয়া হয় নি এর জন্যই ওর আনন্দ আর ধরে না। কিন্তু মনে মনে ভাবল, 'তাহলে ডেকে পাঠানো হল কেন? কে-ই বা ডেকে পাঠাল?'

ইগর ওর মনের ভাব আন্দাজ করতে পেরে মাইক্রোফোন দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'আমাদের ক্যাম্প রেডিও।'

ভাসিয়া ভাবল, 'ও, বুঝতে পেরেছি! রেডিও সেন্টার কী ভাবে কাজ করে তাই দেখাতে চায়। তা বেশ ত, দেখে মজা পাওয়া যাবে।'

কিন্তু ভাসিয়া ঠিক ধরতে পারে নি। ওকে আদৌ এজন্য ডাকা হয় নি। দু'দিন আগে ওদের দলে নতুনদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের একটা অনুষ্ঠান হয় — তাতে নবাগতরা নিজেদের সম্পর্কে বলে, যার যে বিষয়ে দক্ষতা আছে তার নমুনা দেখায়। কেউ গান করে, কেউ নাচে, কেউ বা কবিতা আবৃত্তি করে। ভাসিয়া আন্দ্রেইয়েভের পালা আসতে ওদের বাহিনীর লীডার ইগর জিজ্ঞেস করল:

'তুমি কী করতে জান? গান গাইতে পার? নাচতে জান?'

ভাসিয়া কী বলবে বুঝতে না পেরে কাঁধ ঝাঁকাল। এর কোনটাই তার জানা নেই।

'গান গাইতে পার?' ইগর জিজ্ঞেস করল।

'না,' ভাসিয়া উত্তর দিল।

'নাচতে জান?'

'না।'

'অ্যাকর্ডিয়ান বাজাতে জান?'

'না।'

'তাহলে তুমি কী জান?'

'কম্যান্ড দিতে জানি,' ভাসিয়া ঝট করে বলে বসল।

'বটে!' ইগর অবাক। 'আচ্ছা, তাহলে মাঝখানের গোল জায়গাটায় চলে এসে কম্যান্ড দাও দেখি!'

ভাসিয়া গোল জায়গাটায় চলে এসে সুরেলা গলায় চেঁচিয়ে বলল:

'ব্যায়ামের জন্য তৈরি হও! ডাইনে! গোল হয়ে ছোট! মার্চ!'

ব্যাপারটা ছিল এমনই অনভ্যস্ত আর আচমকা যে ছেলেমেয়েরা এই উৎসাহব্যঞ্জক হুকুম মেনে নিতে এতটুকু আপত্তি করল না — তারা গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করে দিল।

ইগর ভাসিয়াকে লক্ষ করে রেখেছিল, মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল যে ভবিষ্যতে তাকে একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেবে। সেই কারণেই ওকে ডেকে পাঠানো।

'তোমার গলাটা বেশ,' সে বলল। 'আমার ইচ্ছে তুমি আমাদের অ্যানাউন্সার হও।'

অ্যানাউন্সার! কুছ পরোয়া নেই! ভাসিয়া সাহসী ছেলে। জীবনে কখনও সমুদ্র দেখে নি, কিন্তু আর্তেকে এসেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সাঁতার কাটল। মাইক্রোফোনে তার কিসের ভয়!

পাইয়োনিয়র বাহিনীর লীডার ভাসিয়াকে শিখিয়ে দিল কী করে কথা বলতে হয়। লেখা কাগজ তার সামনে রেখে মাইক্রোফোন ধরিয়ে মাথা নেড়ে ইঙ্গিতে শুরু করে দিতে বলল। ভাসিয়া মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে মুখের কাছে এনে চুপ করে রইল। ইগর মাইক্রোফোন বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল:

'কী হল তোমার?'

'ভয়ে বুক কাঁপছে,' ভাসিয়া উত্তর দিল।

'ও কিছু নয়, নাও, ফের চেষ্টা করে দেখা যাক,' এই বলে পাইয়োনীয়র বাহিনীর লীডার মাইক্রোফোন চালু করে দিল।

'অ্যাটেনশন, অ্যাটেনশন,' ভাসিয়া শুরু করে দিল, 'ক্যাম্প রেডিও সেণ্টার। আজ সন্ধ্যায় ক্যাম্প ফায়ারের চত্বরে শখের শিল্পীদের বিচিত্রানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছে এক নম্বর বাহিনীর ছেলেমেয়েরা...'

এখানেই তার থেমে গিয়ে সবটা আবার গোড়া থেকে বলার কথা। কিন্তু ভাসিয়া না থেমে বলে চলল:

'এ ছাড়াও এ অনুষ্ঠানে আমরা কাতিয়া মালাখোভাকে ব্যায়ামের কসরৎ দেখাতে অনুরোধ জানাচ্ছি।'

পাইয়োনীয়র বাহিনীর লীডার সঙ্গে সঙ্গে মাইক্রোফোন বন্ধ করে দিয়ে ভাসিয়ার ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠল।

'তোমার লজ্জা করে না! মাইক্রোফোন খেলার









জিনিস নয়! রেডিওতে তোমার খুশিমতো এতটুকু কথা বলা চলে না — এটা তোমার জানা উচিত!'

'আমি নিজের খুশিমতো বলি নি,' ভাসিয়া বলল, 'আমি সকলের হয়ে বলেছি। কাতিয়া সুন্দর ব্যায়ামের কসরৎ জানে। কিন্তু দেখাতে লজ্জা পায়। আমি ওকে দেখাতে বলেছিলাম, ও রাজি হয় নি। এখন সবাই অনুরোধ করাতে আর 'না' বলতে পারবে না।

কাতিয়া সত্যি সত্যিই 'না' বলতে পারল না।

মায়াপুরী

পাহাড়ের পায়ের তলায় একটা ছোট্ট কাচের বাড়ি।

'এটা কী?' আর্তেকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সময় ভিকা তাদের পাইয়োনীয়র বাহিনীর লীডারকে জিজ্ঞেস করল।

'ক্যাম্পে এমন মায়ামন্ত্রঘেরা জায়গা আর একটাও নেই,' উত্তরে পাইয়োনীয়র বাহিনীর লীডার বলল।

ভিকা আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে বলল, 'তার কারণ এই যে বাড়িটা কাচের, আর এখান থেকে পুরো আর্তেক — সমুদ্র, পাহাড় আর বন দেখা যায়— এই ত?'

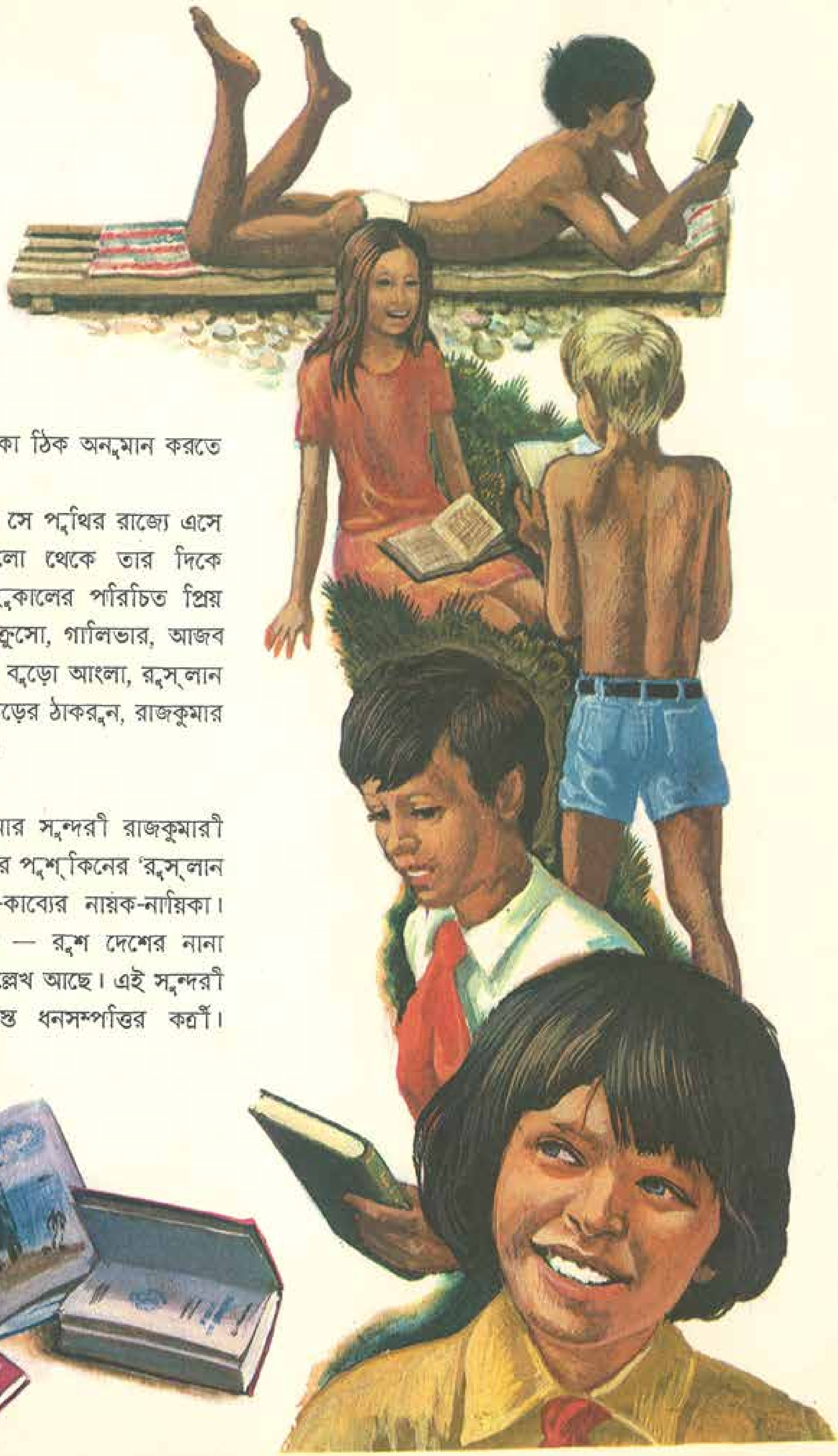
'শুধু আতের্ক কেন?' পাইয়োনীয়র-লীডার বলল। 'এই বাড়িটা থেকে গোটা পৃথিবী দেখা যায়।'

ভিকার তক্ষুনি ইচ্ছে হল এই আশ্চর্য মায়াপুরীটার ভেতরে গিয়ে সেখান থেকে গোটা পৃথিবীটা দেখে।

সে কাচের বাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।







'লাইব্রেরী' — এবারে ভিকা ঠিক অনুমান করতে পারল।

কাচের দরজা খুলতে সে পুথির রাজ্যে এসে পড়ল। বইয়ের তাকগুলো থেকে তার দিকে তাকাতে লাগল তার বহুকালের পরিচিত প্রিয় বন্ধুবান্ধব — রবিনসন ক্রুসো, গালিভার, আজব দেশে এলিস, টম সইয়ার, বুড়ো আংলা, রুসলান ও ল্যুদমিলা, তামা পাহাড়ের ঠাকরুন, রাজকুমার ইভান — এরা সকলে।

মহাবীর রুসলান আর সুন্দরী রাজকুমারী ল্যুদমিলা — আলেক্সান্দর পুশকিনের 'রুসলান ও ল্যুদমিলা' রূপকথা-কাব্যের নায়ক-নায়িকা। তামা পাহাড়ের ঠাকরুন — রুশ দেশের নানা লোক কাহিনীতে এ'র উল্লেখ আছে। এই সুন্দরী রমণী পাতালের সমস্ত ধনসম্পত্তির কর্ত্রী।



সংস্বভাবের, নিঃস্বার্থপর চালাক-চতুর ভালোমানুষদের সামনে তিনি তাঁর অগাধ ধনভাণ্ডার মেলে ধরেন। রাজকুমার ইভান — বহু রুশ লোককথার বিখ্যাত নায়ক।

ভিকা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করল বই ছেলেমেয়েদের হাতে না থেকে এখানে, লাইব্রেরীতে আছে কেন।

লাইব্রেরীয়ান উত্তরে বললেন, 'তার কারণ হয়ত এই যে যারা নতুন এসেছে তারা এখনও জানে না লাইব্রেরী কোথায়।'

ভিকা একটা বই নিয়ে তার বাহিনীতে ফিরে গেল। সন্ধ্যার খাবার আগে সে ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করল ওদের মধ্যে কেউ লাইব্রেরীতে গিয়েছিল কিনা। জানা গেল কেউই যায় নি। শুনে ভিকার খারাপ লাগল। সে ভাবতে লাগল কী করে ওদের লাইব্রেরীতে নিয়ে যাওয়া যায়।

পর দিন সকালে সে তার বাহিনীর সকলকে একসঙ্গে জড় করল। ছেলেমেয়েদের সকলের হাতে ধরিয়ে দিল একটা একটা করে কাগজ। কাগজে লেখা ছিল: 'প্রিয় বন্ধু, আজ লাইব্রেরীতে আসা চাই।' নিমন্ত্রণ পত্রের একেকটার নীচে সই করা ছিল একেকটা নাম — কোনটার নীচে রবিন্‌সন ক্রুসো, কোনটার নীচে টম সইয়ার, কোনটার নীচে রাজকুমার ইভান — এই রকম সব।

'কোথায়? লাইব্রেরী কোথায়?' সবাই কলরব করে উঠল। সকালের খাবারের পর পুরো বাহিনীটা যাত্রা করল লাইব্রেরীর দিকে।

ভিকা ওদের নিয়ে এলো সেই পরিচিত কাচের দরজার সামনে।

গানের গলা নেই

আর্তেকে সবাই গান গায় — এমন কি গানের গলা যাদের নেই, তারাও।

ভল্‌গোগ্রাদের ছেলে ভলোদিয়া স্মির্নভ জীবনে কখনও গান গায় নি। 'গানের গলা নেই' — স্কুলের কোরাস গানের সময় ডাক পড়লে সে সচরাচর এই অছিলা করে এড়িয়ে যেত। ট্র্যানজিস্টর খুললেই ত দিব্যি শোনা যায়! তোমার জন্যে অন্যেরা যদি গান গেয়ে দেয় তাহলে নিজে আর কষ্ট করে গাওয়া কেন?

আর্তেকে যাবার পথেও ভলোদিয়া গান গায় নি, যদিও আর সকলে অবিরাম পথে গান গেয়ে চলেছে। 'গানের গলা নেই' — ওর সেই এক কৈফিয়ত।

অবশেষে আর্তেক। আর্তেক নিজেই যেন একটা গান। ভলোদিয়া পাহাড়ের ওপর উঠে শুনতে ভালোবাসে আর্তেকের জীবনস্পন্দন। সমুদ্রের কোলাহল, পাখি আর ছেলেমেয়েদের কলকাকলি, গানবাজনার আওয়াজ, স্টেডিয়ামে ক্রীড়ামোদীদের চিৎকার-চেঁচামেচি, স্টার্টিং পিস্তলের আওয়াজ, গাছের পাতার মর্মরধ্বনি, লঞ্চের ভোঁ — সব মিলেমিশে যেন হয়ে যায় এক অপূর্ব সুরমূর্ছনা। এ সুর যতক্ষণ খুশি শোনা যায়, শুনে কোন ক্লান্তি আসে না। চার দিকে সবাই যখন অমনিতে গান গাইছে তখন সে আর গান গাইতে যায় কেন?

একদিন ভলোদিয়াকে জানানো হল

আর্তেকের স্টেডিয়ামে নানা দেশের রঙবেরঙের পাইয়োনীয়র টাই আঁটা ছেলেমেয়েদের উৎসব হবে, সে যেন তৈরি থাকে।

'আমি অমনিতেই সব সময় তৈরি,' পাইয়োনীয়র বাহিনীর পরিষদ-প্রধানকে ভলোদিয়া উত্তরে বলল।

'তাই না কি?' বাহিনীর পরিষদ-প্রধান বলল, 'আমরা কিন্তু গান গাইব।'

'কিন্তু আমার গানের গলা-টলা নেই,' ভলোদিয়ার চটপট জবাব।

'জানি, তবে সাবধানের খাতিরে গানের কথাগুলো অন্তত মুখস্থ করে রাখ,' এই বলে সে গানের কথা লেখা একটা কাগজ ওর দিকে বাড়িয়ে দিল।

'আচ্ছা, সাবধানের খাতিরে মুখস্থ করব 'খন,' ভলোদিয়া কথা দিল।

কথা দেওয়া মানে কথা রাখা — পাইয়োনীয়রের ছেলেমেয়েদের এটা মূলমন্ত্র।

শেষকালে উৎসবের দিনটি এলো। ভলোদিয়া স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে বসেছে, নীচে কচি সবুজ ঘাসের মাঠে উড়ছে নীল রঙের ব্যানার। পাশ দিয়ে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে বন্যাস্রোতের মতো চলেছে পৃথিবীর সমস্ত দেশের ছেলেমেয়েরা, তাদের অনেকে ব্যানারের সঙ্গে এ'টেছে জাতিতে জাতিতে মৈত্রী সম্পর্কে নানা সুন্দর সুন্দর বাণী লেখা সাদা কাগজের পায়রা। প্রথম প্রথম গান শোনা গেল আস্তে আস্তে, তারপর ধীরে ধীরে তার জোর বাড়তে লাগল, গান হয়ে উঠল আরও সুরেলা, আরও গমগমে — তার নীচে চাপা পড়ে গেল আর সব আওয়াজ। চার হাজার ছেলেমেয়ে তাদের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়ে গাইতে লাগল... গেয়ে চলল আত্মবিস্মৃত হয়ে, গানে সমস্ত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে।

সকলের সঙ্গে সঙ্গে ভলোদিয়াও উঠে দাঁড়াল। যাতে হংসমধ্যে বক যথা হয়ে না থাকতে হয় তার জন্য সেও নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়াতে লাগল। নাড়াতে নাড়াতে হঠাৎ কোন এক সময় সে উপলব্ধি করল সে যেন গান না গেয়ে থাকতে পারছে না — আপনাআপনি তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে গান... সে অবাক হয়ে লক্ষ করল যে গান গাইতে শুরু করে দিয়েছে। এদিক ওদিক তাকাতে দেখতে পেল নানা রঙের টাই-বাঁধা ছেলেমেয়েদের একটা বিশাল সমুদ্র গান গেয়ে চলেছে, আর নীচে আরেকটা সমুদ্র — কৃষ্ণসাগর — বয়ে চলেছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের তটরেখা ধুইয়ে।

'মৈত্রী... শান্তি... স্বাধীনতা... সুখ,' এই কথা ধ্বনিত হচ্ছে ওদের গানে। ভলোদিয়াও তাদের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণ করে এই একই কথা।

যে মাটি গান গায়

আর্তেকের ছেলেমেয়েরা নিছক শিশু নয়। তারা সংগঠিত ছেলেমেয়ের দল। পাইয়োনীয়রে যারা আছে তারা সকলে ছোট ছোট দলে জোট বাঁধা, ছোট ছোট কতকগুলো দল নিয়ে হয় একেকটা বাহিনী, আর কতকগুলো বাহিনী নিয়ে হয় একেকটা স্কোয়াড — যেমন 'অ্যাম্বার' স্কোয়াড, 'ডায়মণ্ড' স্কোয়াড, 'ক্রিস্টাল' স্কোয়াড, 'ফিল্ড' স্কোয়াড, 'ফরেস্ট' স্কোয়াড, 'রিভার'

স্কোয়াড, 'লেক' স্কোয়াড — এমনি সব। গরম কালে পুরো তিরিশ দিনের জন্য, আর শীতকালে তার চেয়েও বেশি — চল্লিশ দিনের জন্য! — আর্তেকে আসার পর ছেলেমেয়েদের কাজ খুঁজে বার করতে হয় না, কাজ নিজেই তাদের খুঁজে বার করে।

একেকটি বাহিনীতে যে কত রকমের দায়িত্ব আছে! — বাহিনীর পরিষদ সদস্য আছে, ইউনিট লীডার আছে, গ্রুপ লীডার আছে, বিউগল বাজিয়ে, ড্রাম বাজিয়ে, গান বাজনার পরিচালক, ধ্বনিরক্ষক, মার্চের লীডার, মেডিক্যাল অ্যাটেন্ডেন্ট, খেলার টীমের ক্যাপ্টেন, রেফারী, খেলাধুলো ও নাচের আসরের ব্যবস্থাপক — আরও কত কি! কিন্তু ভিতিয়া ক্রিউচ্‌কভ আর্তেকে অন্যদের চেয়ে একটু দেরিতে এসেছে। তাই দেখা গেল, ইতিমধ্যে সব কাজের ভার বিতরণ করা হয়ে গেছে।

'তাতে কোন অসুবিধে নেই,' ওদের বাহিনীর লীডার বোরিয়া বলল। 'তুমি গাঁ থেকে এসেছ ত? তোমার বাবা যৌথখামারে কাজ করেন, তাই না?'

'হ্যাঁ,' ভিতিয়া উত্তর দিল।

'আর কী করেন?' বোরিয়া জিজ্ঞেস করল।

'যৌথখামারের চাষী — বললামই ত,' ভিতিয়া খাপ্পা হয়ে বলল।

কিন্তু বোরিয়ার ধৈর্য আছে।

'সব লোকেই যখন বাড়ি ফিরে আসে তখন কিছু না কিছু একটা কাজ করে। কেউ ছবি আঁকে, কেউ ফোটো তোলে, কেউ বা মাছ ধরে...' সে বলল।

'ও, এই কথা!' ভিতিয়া এবারে কথাটা ধরতে পেয়ে বলল। 'আমার বাবা মাটির জিনিস বানায়...'

'আর তুমি?'

'আমি?' ভিতিয়া সলজ্জ ভাবে বলল। 'আমিও বানাই।'

'তাহলে আর কী?' পাইয়োনীয়র লীডার বলল। 'অন্যদেরও শেখাও।'

ভিতিয়াকে আর পায় কে!

সে বলল, 'বেশ শেখাব। আপনিও শুনতে পাবেন...'

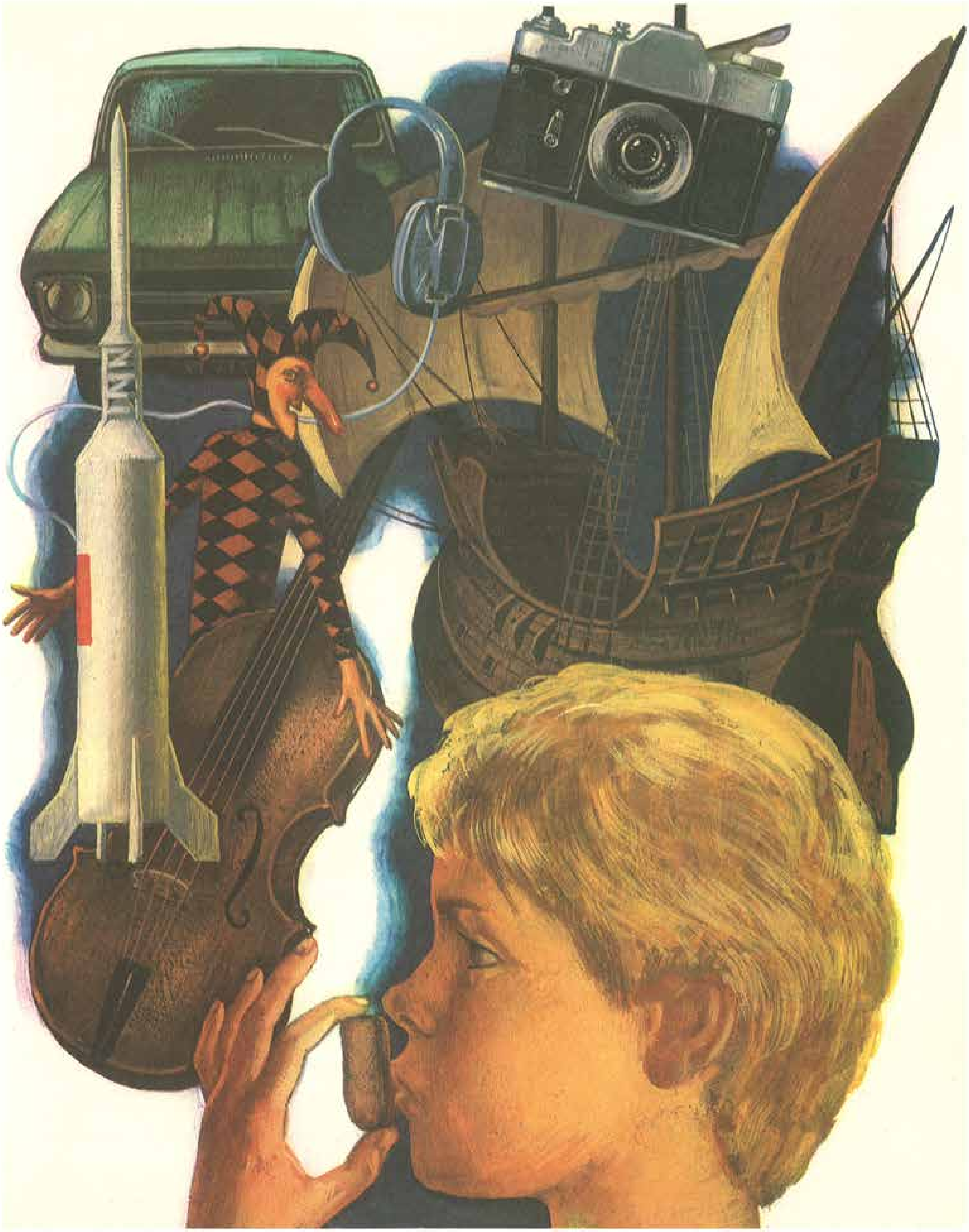
বোরিয়ার মনে হল ভিতিয়া বুঝি ভুল বলল। আসলে বলতে চায় 'দেখতে পাবেন,' তার বদলে বলেছে 'শুনতে পাবেন'। তাই সে ওকে শুধরে দিল, কিন্তু ভিতিয়া তার সংশোধন অর্ধেক গ্রহণ করল মাত্র।

সে বলল, 'দেখতে পাবেন, আবার শুনতেও পাবেন। আমার যা দরকার তা হল সামান্য এঁটেল মাটি আর এক টুকরো প্লাইউড।'

সেই দিনই ভিতিয়া বাইরে একটা ঝাঁকড়া প্লেইন গাছের ছায়ায় এঁটেল মাটি মাখতে বসল। ছেলেমেয়েরা যখন দেখতে পেল ও ময়দার তালের মতো করে মাটি ছানতে শুরু করেছে তখন কেউ কেউ 'ভিতিয়া মাটি দিয়ে পিঠে বানানোর মতলব করছে রে! নিজেই ওগুলো খাবে!' এই বলে ওকে টিটকিরি দিতে লাগল।

ওদের দলের সকলে ভিতিয়ার পেছনে আঠার মতো লেগে রইল — তাদের প্রশ্ন, 'বল্, দেখা, কী করছিস।' উত্তরে ভিতিয়া বলল, 'মাটির তালকে গান শেখাচ্ছি।'

মাটির তালটাকে ছেনে ছেনে সে তাই দিয়ে একটা সরাপিঠে মতন বানাল। ওটাকে তর্জনীর চারধারে জড়াতে পুরু তলাসমেত একটা ছোট্ট কল্কের আকার পেল। আঙুল বার না করে সে তলা চিরে ফাটল করে নিল, পাশে একটা গোঁজ ফুটিয়ে আরও একটা ফুটো করল। এবারে আঙুল



বার করে এনে খোলা দিকটা বন্ধ করে দিল। ফাটলে ফুঁ দিল — মাটি গান গেয়ে উঠল।

সকলে হৈচৈ শুরু করে দিল:

'আমাকে শেখা! আমাকে শেখা!'

'বেশ,' ভিতিয়া বলল, 'কিন্তু তার বদলে তোমরা আমাকে কী শেখাবে শুনি?'

'আঁকা শেখাব... কাঠ পুড়িয়ে নক্সা বানাতে শেখাব... কাঠ খোদাই শেখাব... ছবি তুলতে শেখাব...' চারদিক থেকে রব উঠল।

দেখা গেল ওদের সকলেই কোন না কোন কাজ জানে এবং কিছু না কিছু শেখাতে পারে।

আর্তেকে যে কত রকমের শখ চর্চার আসর আছে তার কোন ইয়ত্তা নেই। মোটরগাড়ি চালানো, এরোপ্লেন মডেলিং, যন্ত্রপাতির ডিজাইন তৈরি, রেডিও, ফোটোগ্রাফি, রকেট তৈরি, সিনেমা, গাড়ির মডেল তৈরি, খেলনাপাতি, খেলাধুলো, ডালপালা-কুটোকাটা দিয়ে কাটুম-কুটুম তৈরি, খুদে প্রকৃতিবিজ্ঞানীদের আসর, লোকবিজ্ঞান — আরও কত কি! কিন্তু কেউ যদি কোন্ আসর তার মনের মতন হবে বুঝে উঠতে না পারে তাহলে অন্যেরা তাকে নতুন কিছু দেখাতে পারে। আর্তেকে শেখা বিদ্যা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে।

সাবা

আর্তেকে যে আসে সে-ই কিছু না কিছু সঙ্গে করে নিয়ে আসে — কেউ গান, কেউ ক্যাম্পের মিউজিয়ামের জন্য প্রদর্শনীর জিনিস, কেউ বাড়ির তৈরি কোন জিনিস, কেউ আঁকা ছবি, কেউ বা এম্ব্রয়ডারী।

সোভিয়েত ইউনিয়ন খুব বড় দেশ। এখানে নানা জাতির লোকের বাস। প্রত্যেক জাতির নিজের নিজের ভাষা আছে, রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ আছে, আর বাচ্চাদেরও — বুঝতেই পারছ — যার যার নিজের খেলাধুলো আছে। কিন্তু এদেশের পনেরোটি অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বেশ মিলমিশ আছে। সবগুলো অঙ্গরাজ্য থেকে ছেলেমেয়েরা আর্তেকে আসে, তারা সবাই রুশ ভাষায় কথা বলে, তার ফলে তারা সকলে ঝটপট এখানে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, নতুন নতুন বন্ধুত্ব পাতায়। তাদের অনেকে যে অন্যদের কাছে তাদের জন্মস্থানের পরিচয় দিতে চাইবে, তাদের জাতীয় খেলা, নাচ আর গান বাজনার নমুনা দেখাতে চাইবে এতে আর আশ্চর্য কী!

এস্তোনিয়ার মেয়ে ইর্মা। সাদা ফেকাশে রঙের চুল তার। একবার তার বাহিনীর বন্ধুরা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কী সঙ্গে করে এনেছিস?'

'গোরু,' মেয়েটা উত্তর দিল।

'খেলনা বুঝি?' বাহিনীর সকলে জিজ্ঞেস করল।

'সত্যিকারের,' ইর্মা উত্তর দিল।

'কোথায় সেটা?'

'এইখানে,' চালাক-চালাক ভঙ্গিতে মুচকি হেসে সে আঙুল দিয়ে নিজের কপালে টোকা মারল। তার মানে ওর মাথার ভেতরে আছে।

এর কিছু দিন বাদেই ইর্মাদের বাহিনীর

সকলে জানতে পারল যে আর্তেকে জাতীয় খেলাধুলোর প্রতিযোগিতা হতে যাচ্ছে। ওদের বাহিনীর পরামর্শসভা বসল, কাকে প্রতিযোগিতায় পাঠানো যায় এই নিয়ে আলোচনা চলল।

'আমাকে পাঠান,' ইর্মা যেচে বলল, 'আমি নাম ডোবাব না — পাইয়োনীয়রের নামে দিব্যি করে বলছি!'

তা 'পাইয়োনীয়রের দিব্যি' যখন, তখন না পাঠানোর কী কারণ থাকতে পারে? অমন দিব্যি ত আর অমনি-অমনি কেউ করে না!

প্রতিযোগিতা ত শুরু হল। খেলার মাঠে প্রথম নামল রুশীরা, তারা দেখাল 'স্‌ভাইকা' কী করে খেলতে হয়। এই খেলায় মাটিতে একটা লোহার রিং পেতে তার ভেতরে ছুঁচালো শলা লাগানো বল্‌ ছুঁড়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে হয়।

এরপর এলো ইউক্রেনীয়রা — তাদের হাতে লাঠি। এই লাঠির নাম শ্‌কান্দিব্‌কি। এই খেলায় লাঠি এমন ভাবে ছুঁড়তে হয় যাতে শূন্যে চাকার মতো বন্‌বন্‌ করে ঘুরতে থাকে।

মোলদাভীয়রা যে খেলা দেখাল তার নাম 'লুং-মেগার' — অনুবাদে যার অর্থ 'দীর্ঘকায় গর্দভ'। তারা একে অন্যের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াল — যেমন লোকে গাধার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়ায়।

উজবেকরা এক পা বেল্‌ট দিয়ে টেনে ওপরে তুলে একটি মাত্র পায়ে দৌড় দেখাল। কির্গিজরা একটা রঙিন রুমালের চারধারে বাজনার তালে তালে লাফাতে লাগল, বাজনা থামার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই সেই রুমালটা প্রথম ধরার চেষ্টা করল।

'এস্তোনিয়া!' জুরির সভাপতি ঘোষণা করতে ইর্মা এগিয়ে এলো।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে সে এক টুকরো প্লাইউড আর খানিকটা চক চাইল। দুটোই যখন পাওয়া গেল তখন সে প্লাইউডের টুকরোটা সাইপ্রেস গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে তার ওপরে আঁকল একটা গোরু।

ছেলেমেয়েরা হেসে কুটিপাটি — গোরুটার লেজ নেই।

'লেজ!... লেজ আঁক!' ওরা চেঁচিয়ে বলল।

কিন্তু ইর্মা মাথা নেড়ে জানাল যে লেজ আঁকার কোন দরকার নেই।

'লেজ আছে!' সে চেঁচিয়ে বলল। 'তবে ওখানে নেই, আছে এই এখানে!' এই বলে সে পকেট থেকে বার করল কাপড়ের তৈরি একটা লেজ। তারপর একটা কালো কাপড়ের ফালি বার করে বলল যে যারা যারা এস্তোনিয়ার মজাদার লৌকিক খেলা 'সাবা' খেলতে চায়, তারা এগিয়ে আসতে পারে।

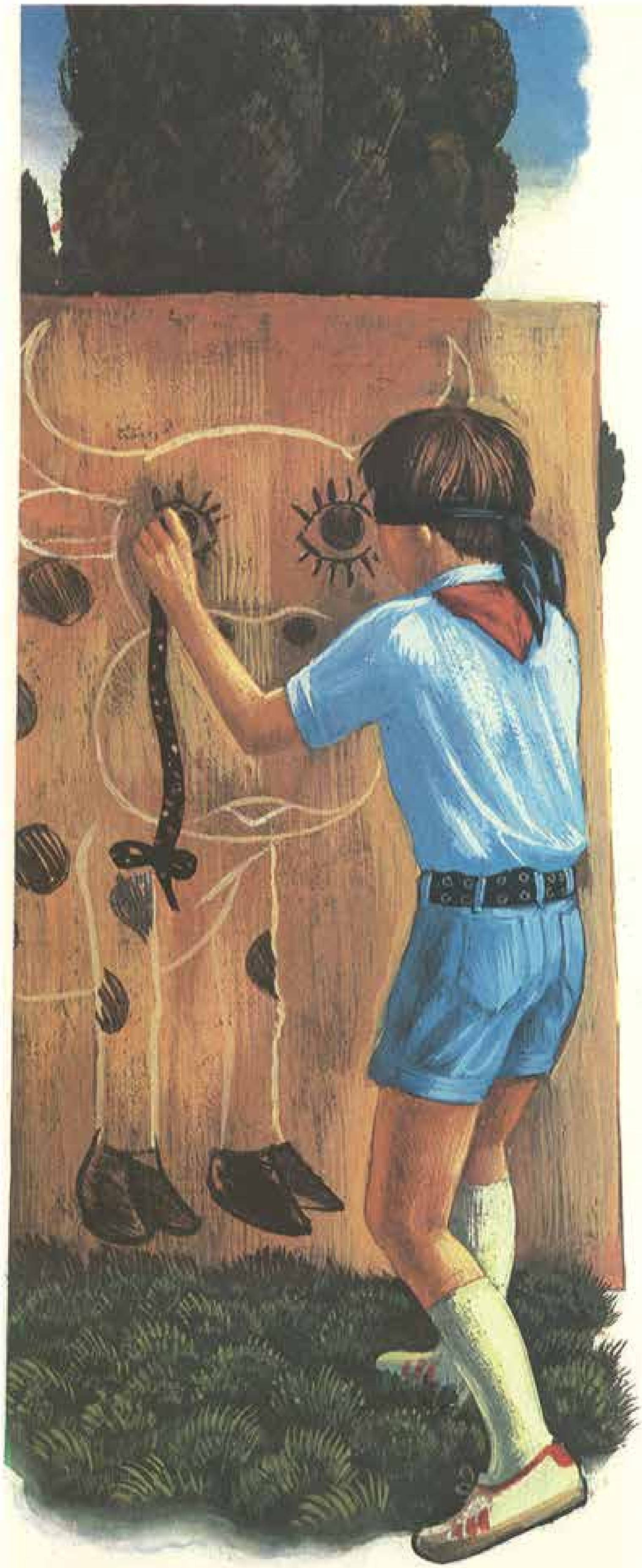
প্রায় সকলে ছুটে গেল ইর্মার দিকে। কিন্তু ইর্মা ওদের মধ্যে থেকে শুধু একজনকে বেছে নিল, বাদবাকি আর সকলকে পর পর সার বেঁধে দাঁড় করিয়ে দিল। যাকে বেছে নিয়েছিল, তার চোখ বেঁধে দিয়ে হাতে গোরুর লেজ আর বোর্ডপিন ধরিয়ে দিল, তাকে একই জায়গায় তিনবার ঘুরপাক খাইয়ে ছেড়ে দিয়ে গোরুর লেজটা পিন দিয়ে জায়গায় এ'টে দিতে বলল।

ইর্মা যে ছেলেটাকে বেছে নিয়েছিল তাকে সাহসীই বলতে হবে। ইর্মা যা যা বলল সব সে করল — গোরুর কাছে এগিয়ে এসে পিন দিয়ে লেজ এ'টে দিল... কোথায়? না, যেখানে গোরুর শিঙ গজায় সেই জায়গায়।

সকলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। ছেলেটা চোখের বাঁধন খুলে ফেলে যখন তার নিজের হাতের কারবার দেখতে পেল তখন সে নিজেও







হেসে বাঁচে না। তার জায়গায় সঙ্গে সঙ্গে চলে এলো পরের জন। 'সাবা' খেলা চলতে লাগল। ইর্মার জয়জয়কার পড়ে গেল।

'বেদানা'

ফুটবল খেলার মাঠে ভয়ঙ্কর গতিতে দুমদাম বল্ ছুটছে। কিছুটা দূরে অন্য খেলোয়াড়দের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে গালে হাত চেপে কাঁদছে এক খুদে ফুটবল খেলোয়াড় — ফিনল্যাণ্ডের ছেলে ইয়ানিস।

ভিতিয়া প্রখরভ পাশ দিয়ে ছুটছিল সমুদ্রের দিকে। ছোট ফিন ছেলেটাকে কাঁদতে দেখে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'কী হয়েছে তোমার?' সে জিজ্ঞেস করল।

ইয়ানিস জবাব দিল, কিন্তু কী যে বলল, ভিতিয়া বুঝতে পারল না। অনুমান করল যে ছেলেটা বিদেশী, তাই রুশী জানে না। তবে কাঁদছে যখন, তখন কেউ না কেউ ওকে দুঃখ দিয়েছে।

কে ওকে দুঃখ দিতে পারে দেখার জন্য ভিতিয়া চার ধারে চোখ বুলাল, কিন্তু ধারেকাছে কাউকে দেখতে পেল না। তখন ভিতিয়া ঝুঁকে পড়ে মাটির ওপর একটা প্রশ্নচিহ্ন এ'কে হাতের মুঠি পাকিয়ে নিজের গালে ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

ছেলেটা বিষণ্ণ হাসি হেসে অতি কষ্টে ঠোঁট নেড়ে জবাব দিল, 'বেদানা।'

ভিতিয়া ত থ — 'বেদানা?' অমন নাম সে জীবনে শোনে নি! কিন্তু সে যা হোক — শুনুক না শুনুক, এই পাজী বেদানা বাছাধনকে আর দেখতে হচ্ছে না! আর্তেকে

মারপিট করার আর অতিথিদের দুঃখ দেওয়ার ফল যে কী ও তাকে টের পাইয়ে দেবে — পাইয়োনীয়র বাহিনীর পরিষদে জবাবদিহির জন্য ওকে টেনে আনবেই আনবে!

ভিতিয়া ভ্রূকুটি করে ছোট ছেলেটার দিকে তাকাল।

'কোথায় সেই বেদানা?'

'এই যে!' এই বলে ফিন ছেলেটা তার ফোলা গালটা দেখিয়ে দিল।

ভিতিয়া আরেকটু হলেই হাসিতে ফেটে পড়ে আর কি! কিন্তু সময় থাকতে সে নিজেকে সামলে নিল।

'দাঁত,' সমবেদনা জানিয়ে সে বলল।

'দাঁত,' ইয়ানিস কঁকিয়ে বলল।

ভিতিয়া এবারে রেগে উঠল। সে বলল, 'তা-ই যদি হয় তাহলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার!'

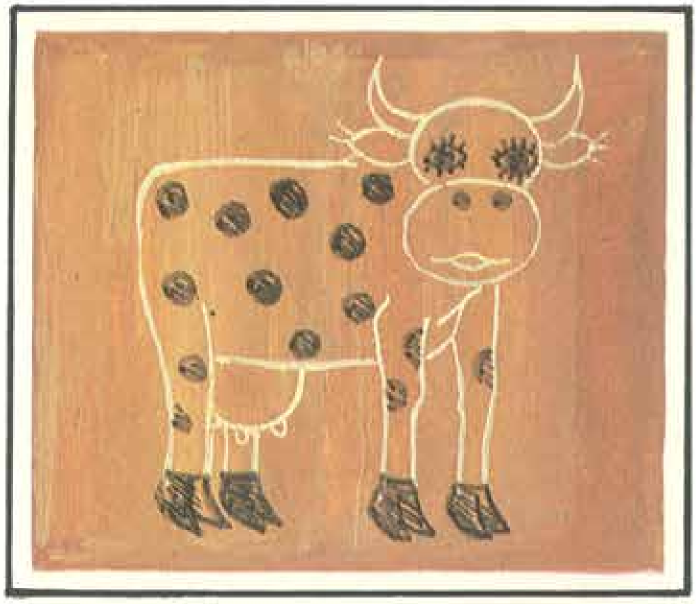
ডাক্তারের নাম শুনে ইয়ানিস পেছনে সরে গেল। ভিতিয়া মনে মনে চিন্তা করল, 'ভীতু দেখছি।' সে তাই এখন পীড়াপীড়ি ছেড়ে দিয়ে আরও সরাসরি পন্থা ধরার সিদ্ধান্ত নিল। যারা ফুটবল খেলছিল তাদের সে শিস দিয়ে ডেকে বলল:

'এই যে... ওর দাঁত ব্যথা করছে... কিন্তু ভয় পাচ্ছে ডাক্তারের কাছে যেতে।'

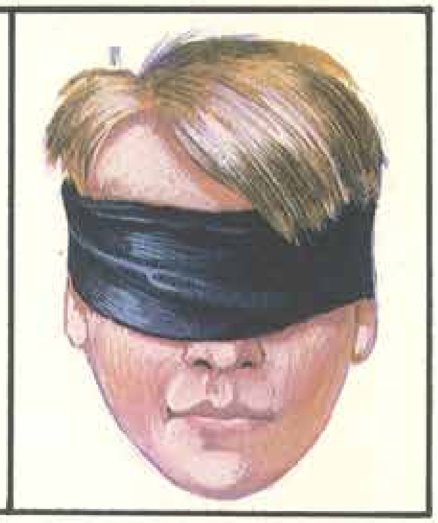
কী করা যায়? ছেলেরা খানিকক্ষণ চিন্তা করল, তারপর ওদের মধ্যে দুজন হঠাৎ নিজেদের গাল চেপে ধরে কাঁদ-কাঁদ গলায় বিলাপ করতে লাগল:

'ওরে আমার দাঁত রে, আমার দাঁত!..'

বিদেশী ছেলেটা ঘটনার এরকম মিল দেখে অবাক হয়ে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সঙ্গীদের দিকে তাকাল। কিন্তু বাকি ছেলেরা অযথা সময় নষ্ট না করে ঐ দুই রোগীকে ত বগলদাবা করলই









সেই সঙ্গে ইয়ানিসকেও পাকড়াও করে টানতে টানতে নিয়ে চলল দাঁতের ডাক্তারের কাছে। বাকি যে দু'জনের হঠাৎ দাঁতে ব্যথা উঠেছিল তারা কোন রকম বাধা দিচ্ছে না দেখে সেও বন্ধুদের চাপের কাছে নতি স্বীকার করল।

দাঁতের ডাক্তার ত দেখে অবাক! তিনি ভাবলেন, 'পুরো ফুটবল টীমের সকলেরই কী একসঙ্গে দাঁত ব্যথা শুরু হয়ে গেল? এ কী করে হয়?' কিন্তু ভিতিয়া সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কানে কানে বলল আসল ব্যাপারটা কী। তিনি তখন ফিন ছেলেটার দিকে তাকিয়ে সস্নেহে হেসে বললেন:

'অতিথির সম্মান সবার ওপরে। সুতরাং তার দাবি সকলের আগে। চেয়ারে স্বাগত জানাই...'

ভিতিয়া তার সাধ্যমতো যা করার করেছে ভেবে স্নান করার জন্য জলের দিকে ছুটে গেল। ফেরার পথে দেখতে পেল দাঁতের ডাক্তার ইয়ানিসের গায়ের কোর্তাটা হাতে নিয়ে হাসপাতালের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে হতভম্ব হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। 'ভুলে গেছে আর কি' — এই ভেবে ভিতিয়া কোর্তাটা নিয়ে ফিন ছেলেটার খোঁজে চলল। ওর দেখা পেতে দেরি হল না — ফুটবল খেলার মাঠে ইয়ানিস পাগলের মতো বল্-এর পেছন পেছন ছুটছে। ভিতিয়া ওকে ডেকে কোর্তাটা বাড়িয়ে দিল। কিন্তু ইয়ানিস তার দিকে ফিরেও তাকাল না। তার জিন্সের পোশাকের পকেট কেন যেন হাতড়াল, তারপর হাত বাড় করে এনে খালি হাতের তালু রুশী ছেলেটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল:

'কোপেক নেই!'

ভিতিয়া অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কোপেক দিয়ে কী হবে?'

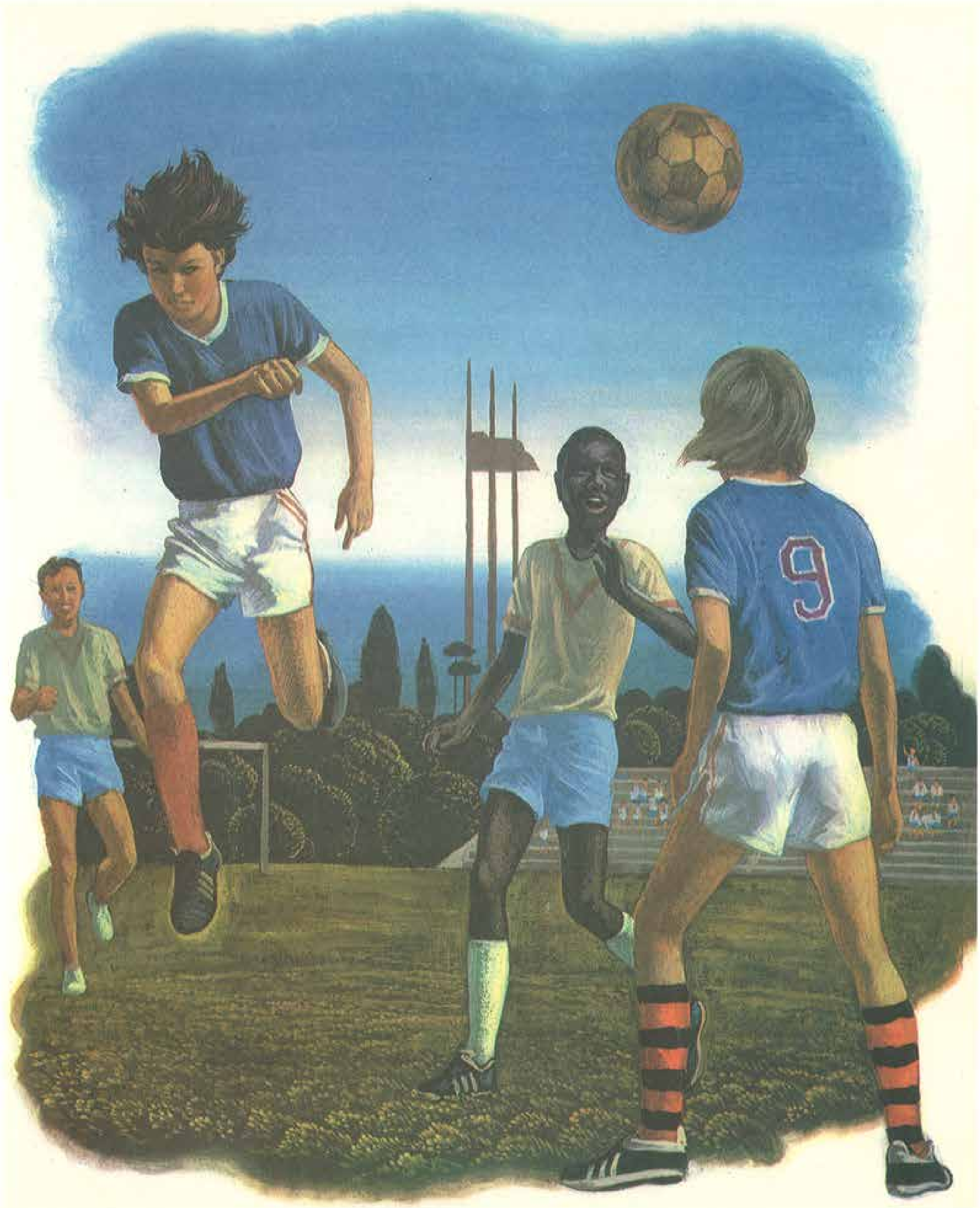
ফিন মৃদু হেসে তার স্বাভাবিক হয়ে আসা গালে হাত বুলাল।

'দাঁত ভালো — কোপেক নেই। ডাক্তারের দাম,' মাথা নেড়ে ইশারায় কোর্তাটা দেখিয়ে তারপর হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে বলল, 'কম?'

ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ভিতিয়ার কিছু বুঝতে বাকি রইল না। ছেলেটা আসলে এখনও সোভিয়েত ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে নি। সে যেখান থেকে এসেছে সেখানে, পুঁজিবাদী দেশে, সব কিছুর জন্য — এমন কি চিকিৎসার জন্যও টাকা দিতে হয়।

'এক পয়সাও দরকার নেই,' ইয়ানিসকে তার কোর্তাটা ফেরত দিতে দিতে বলল সে, 'সোভিয়েত দেশে চিকিৎসার জন্য কোন খরচ লাগে না।'




9

ইয়ানিস কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল, ভিতিয়ার কথাগুলো মনে মনে উপলব্ধি করার চেষ্টা করল; তারপর রঙবেরঙের কোর্তাটা গায়ে ফেলে ফুটবল খেলোয়াড়দের দঙ্গলের মধ্যে ছুটে গেল বল্-এর পেছনে তাড়া করতে।

ডুয়েল

এক নম্বর বাহিনীতে রাজ্যের মেয়ে আর মেয়ে। সংখ্যায় ছেলেদের দেড়গুণ বেশি। তাই আরও একটা মেয়ে দলে আসার কথা হতে কেউ কেউ খুব একটা খুশি হতে পারল না। মেয়েটা ছিল ফরাসী তার নাম সুজানা।

নতুন মেয়েটার সোনালি চুল। ইগর আর কোস্তিয়ার ভালোই লাগল ওকে। তারা ওর সামনে নিজেদের সাহস, শক্তি আর বাহাদুরি জাহির করার কোন সুযোগ ছাড়ল না।

কয়েক দিন কাটার পর ফরাসী মেয়েটি তার রুশী বান্ধবীদের কাছে অভিযোগ করল। সে বলল ইগর আর কোস্তিয়া ওর সঙ্গে ভাব করতে চায় — ও জানে না কী করা উচিত।

'তুই কি ওদের সঙ্গে ভাব করতে চাস না?' মেয়েরা জিজ্ঞেস করল।

'আরে না না, খুব চাই,' সুজানা বলল।

'তাহলে আর ভাব করতে অসুবিধেটা কী আছে?' রুশী মেয়েরা বলল।

'আরে না, ব্যাপারটা তা নয়,' সুজানা বলল, 'ওরা দু'জনে একসঙ্গে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চায় না। ওদের দু'জনেরই ইচ্ছে, আমি যেন কেবল তার সঙ্গেই বন্ধুত্ব পাতাই।'

মেয়েরা হো-হো করে হেসে উঠল, 'কী করতে যাচ্ছিস তাহলে?'

'আমি জানি, কী করতে হবে!' সুজানা উল্লসিত হয়ে বলল। 'ডুয়েলের ব্যবস্থা করতে হবে — আবার কী!'

রুশী মেয়েরা শুনে হতভম্ব। ডুয়েল? ঘুষোঘুষি নাকি?

'না,' সুজানা বলল, 'ঘুষোঘুষি ডুয়েলে চলবে না। এ হবে অন্য ডুয়েল — দাবা খেলার ডুয়েল।'

'দাবা খেলার!' রুশী বান্ধবীরা অবাক।

'ঠিক তাই,' সুজানা বলল, 'দাবা খেলার। দাবা খেলায় যে আমাকে হারাতে পারবে তার সঙ্গেই আমি বন্ধুত্ব করব।' এই বলে সে ধড়িবাজের মতো মুখ টিপে হাসল।

বান্ধবীরা মুখ চাওয়াচাউয়ি করল, তারা করুণার দৃষ্টিতে তাকাল সুজানার দিকে। ইগর আর কোস্তিয়া হল তাদের স্কোয়াডের সেরা দাবা খেলোয়াড়। সুজানাকে আগে থাকতে সাবধান করে দিতে হয়।

'ও কিছু নয়,' সুজানা বলল, 'ঐ যে কথায় বলে না, সময়ে দেখা যাবে।'

'ডুয়েলে' ডাক পড়েছে জেনে ছেলেদুটোর আনন্দ আর দেখে কে! ওদের দু'জনের যে কেউ সুজানাকে দুচালে মাত্ করে দিতে পারে!

প্রথমে দান ফেলা হল। ইগরের পালা প্রথম খেলার। খেলায় বসতে না বসতে সে মাত্ হয়ে গেল — বোঝারই অবকাশ পেল না কোথা থেকে কী ঘটে গেল।

রেফারী ছিল মেয়েরা। তারা কলবল করে উঠল:

'হেরে গেছে! হেরে গেছে!'

সেই একই কোলাহল উঠল কোস্তিয়ার বেলায় — তারও অবস্থা হল ইগরের মতো।

সুজানা তখন বিজয়িনী হিশেবে তার নিজের ইচ্ছে প্রকাশ করল। দুই দাবা খেলোয়াড়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল যে সে দু'জনের সঙ্গেই বন্ধুত্ব পাতাবে, আর অন্যান্য ছেলেরা যদি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চায় তাদেরও সে নিজের দলে নেবে। ইগর ও কোস্তিয়া আপত্তি করল না। দ্বৈতের মধ্যে কোন ফাঁকি ছিল না, সুজানা যে জিতেছে সেটাও সৎ উপায়ে। আর বিজয়ীর ইচ্ছা — তাকে ত আইন বলেই মেনে নিতে হয়! কিন্তু হার হওয়ার জন্য ভেতরে ভেতরে ওরা দু'জনেই মনে বড় আঘাত পায়। ওরা ত আর জানত না যে সুজানা প্যারিসের শ্রমিকপল্লীর জুনিয়র দাবা চ্যাম্পিয়ন!

কাচের লেফাফা

চিঠিটা লিখতে শুরু করল রুশী মেয়ে ওলিয়া।

'এই চিঠি আর্তেক থেকে পাঠানো হচ্ছে শান্তি দিবসে। চিঠি লিখেছে নানা দেশের ছেলেমেয়েরা।'

বেলোরুশিয়ার ছেলে আন্দ্রেই যোগ করল:

'আমাদের সবচেয়ে প্রিয় গানের কথাগুলো হল: 'সূর্য যেন রহে চিরকাল, নীলাকাশ রহে চিরকাল, রহে যেন মামণি আমার, চিরকাল আমি রহি আর।'

ইউক্রেনের মেয়ে অক্সানা তার সঙ্গে জুড়ে দিল:

'আমরা পৃথিবীর সব দেশের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে চাই।'

মার্কিন দেশের ছেলে এর্‌ভিন লিখল:

'বড়রা! ছোটদের সকলের আজকের দিন এবং আগামীকাল যাতে মেঘমুক্ত আর উজ্জ্বল থাকে তার জন্য যা যা করার করুন! পৃথিবীতে যাতে যুদ্ধ না বাধে তার জন্য যা যা করার করুন!'

ফিনল্যাণ্ডের রেইমো লিখল ফিন ভাষায়:

'আর্তেকে ছোটদের সকলের যেমন বন্ধুত্ব, সব ছেলেমেয়েদের বন্ধুত্ব তেমনি দৃঢ় হোক।'

তার পর সকলে মিলে ভেবে বার করল চিঠির শেষ কথাগুলো: 'আমাদের এই গ্রহ রোজ সকালে ঘুম ভাঙার পর যেন সূর্য, বন্ধু আর শান্তির নাম করতে পারে।'

এই দিন বহু চিঠি লেখা হয়। সেগুলো একেকটা বোতলে পুরে বোতলের মুখ এ'টে দেওয়া হয়। গোধূলিবেলায় আর্তেকের ঘাট থেকে নানা রঙের টাইবাঁধা ছেলেমেয়ের দল মোটর বোটে করে যাত্রা করল। তাদের পেছনে পেছনে তীরভূমি ধরে এগিয়ে চলল মশালের শোভাযাত্রা। সামনে ঝলমল করছে আকাশের তারা, শান্তিপূর্ণ সমুদ্রের বুক চিরে চলেছে জাহাজ।

'আমরা নিরপেক্ষ জলসীমানায় এসে গেছি!' একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে বোট



থেকে সমুদ্রের জলে ঝপাং ঝপাং করে গিয়ে পড়তে লাগল কাচের লেফাফায় আর্তেকের চিঠি। চিঠিগুলোতে লেখা ছিল একটিই ঠিকানা: 'পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে।'

উৎসবের নিশান ওঠানো হল। সারা সপ্তাহ জুড়ে এ নিশান উড়তে থাকবে আর্তেকের মাথার ওপরে। সারা সপ্তাহ ধরে সোভিয়েত দেশের সমস্ত প্রজাতন্ত্র এবং পৃথিবীর আরও বহু প্রান্তের ছেলেমেয়েদের নাচ-গান, আবৃত্তি, ছবি আঁকা ও কবিতা লেখার প্রতিযোগিতা চলতে থাকবে।

দিনগুলো যেন দেখতে দেখতে চলে যায়। উৎসবের এমন এক দিনে নাচের আসরে নামল নভসিবির্স্কের মেয়ে এম্মা আর ত্‌বিলিসির ছেলে গেওর্গি। কী সুন্দর নাচ তারা নাচল! সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং সমুদ্র উল্লসিত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ভিড়ে নাচিয়েদের করতালিধ্বনি পুরস্কার দিচ্ছেন।

অশ্রুকণা

আর্তেক উৎসব-অনুষ্ঠান ভালোবাসে। আর্তেকে শান্তি ও সংহতি দিবস উদ্‌যাপন করা হয় আন্তর্জাতিক মরশুমের সময়, যখন বিদেশ থেকে ছেলেমেয়েরা সেখানে আসে। সকাল থেকে ক্যাম্প ফায়ার জ্বালানোর জায়গাগুলোতে নানা ভাষায় গান শোনা যায়, উপহার বদলাবদলি চলে, খুদে নাচিয়েরা নাচে, খুদে সুরকার, ভাস্কর, কবি ও চিত্রশিল্পীরা তাদের কলানৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। আর সন্ধ্যাবেলায় দেখা যায় মশাল শোভাযাত্রা, বোতলের লেফাফাকে পাঠানো হয় সমুদ্রযাত্রায়।

নিনা বুর্লাকভা এসেছে বেলোরুশিয়া থেকে। আঁকতে সে পারে না। নিজের দেশে থাকতে, স্কুলে, এই নিয়ে সে বড় একটা মাথা ঘামায় নি— আঁকার প্রতিভা নেই ত কী হয়েছে? — ভালো গান ত গাইতে পারে! কিন্তু এখানে, আর্তেকে আসার পর নিনার এই ভেবে আফশোসের সীমা নেই যে সে আঁকতে জানে না। আঁকা মানে, পেন্সিল দিয়ে নয় কিন্তু, চক দিয়ে।

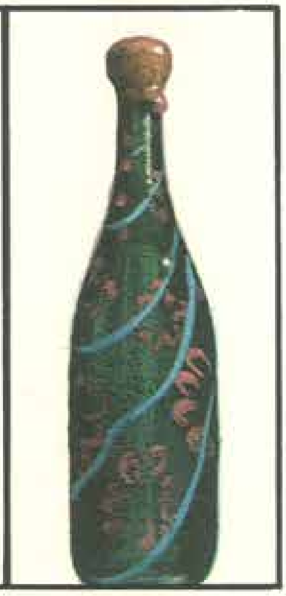
আর্তেকে আসার পর নিনা জানতে পারল যে শান্তি ও সংহতি দিবস উপলক্ষে অ্যাসফল্‌টের ওপর ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা হবে। আঁকার হাত না থাকলেও নিনা ঠিক করল সে এতে যোগ দেবে।

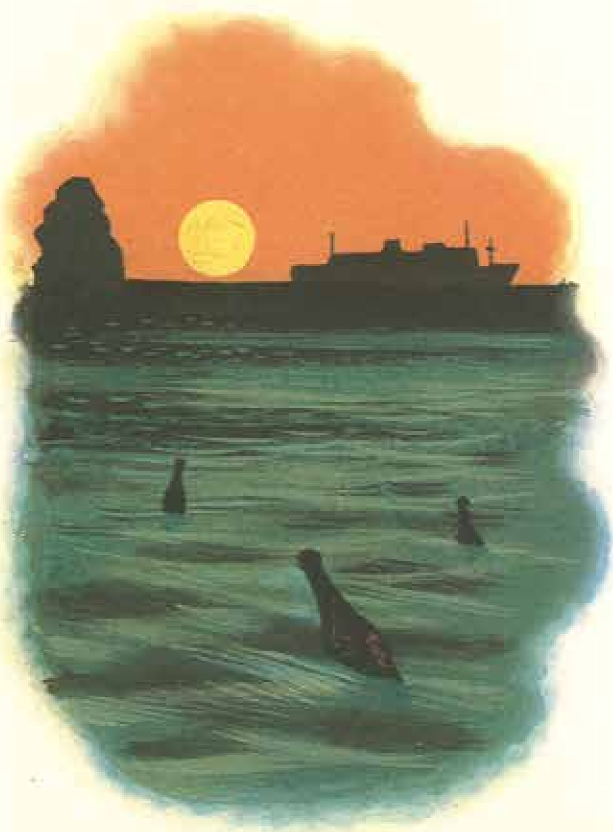
প্রতিযোগিতা হচ্ছিল স্কুলের পাশের চত্বরটায়।

চক হাতে নেওয়ার আগে নিনা অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল। সে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল অন্যেরা কেমন দক্ষতার সঙ্গে ছবি আঁকছে। দেখে তার ঈর্ষা হচ্ছিল, আশ্চর্য লাগছিল। এরা যেন সত্যিকারের এক‌েকজন যাদুকর! হাতে ওদের তুলি নয়, পেন্সিল নয়, স্রেফ সাধারণ চক — হলই না হয় রঙিন — কিন্তু তা দিয়েই অ্যাসফল্‌টের ওপর কেমন সব ছবি আঁকছে! উজ্জ্বল নীল রঙের পৃথিবী, তার গায়ে মধ্যরেখা আর অক্ষরেখা... তার মাথার ওপরে সাদা ধবধবে পায়রা... গাঢ় নীলরঙের মহাকাশযান।... কলকারখানার সুন্দর লাল রঙের সমস্ত চিমনি।... সোনালি ফসল খেত।... কিন্তু নিনা এখন কী করবে? কোন্ রঙের চক দিয়ে সে আঁকবে?









আজ সকালে সভায় বক্তৃতা দিয়েছিল চিলির কিছু ছেলেমেয়ে — তারা এখানে এসেছে পাইয়োনীয়রের কাজের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য। নৃশংস জাণ্টা সরকারের অধীনে চিলির মেহনতীদের অবস্থা যে কী ভয়াবহ তারা সেই বর্ণনা দেয়। ওদের সেই বৃত্তান্ত নিনার মনে পড়ে যেতে সে থলে থেকে রঙিন চক বার করল। কিন্তু না, সে যে ছবি আঁকবে বলে মনে মনে ভেবেছে একটা রঙও তার উপযুক্ত নয়। সে নেমে চলে গেল তাদের ক্যাম্পে। সেখানে ক্যাম্প ফায়ার জ্বালানোর চত্বরে সে একটুকরো কাঠকয়লা খুঁজে পেয়ে তাই নিয়ে ফের ওপরে উঠল। এবারে কাজ শুরু না করলেই নয়। চার দিক থেকে নানা ভাষায় রব শোনা যাচ্ছে: 'আমার হয়ে গেছে! আমার হয়ে গেছে!'

নিনা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে অ্যাসফল্টের ওপরে আঁকল একটা বিরাট ভয়ঙ্কর জেলখানার গরাদ — চারটে লম্বা লম্বা কালো রেখা, চারটে সমান্তরাল। তারপর সাদা চক দিয়ে গরাদের পেছনে আঁকল তিনটে অশ্রুকণা। স্রেফ তিনটে অশ্রুকণা! 'চিলি — নিনা তার ছবির শিরনাম লিখল।

এবারে সে উঠে দাঁড়াল, ফের দেখতে চলল অন্যদের আঁকা ছবি। ঘুরে ঘুরে দেখার পর যখন ফিরে এলো ততক্ষণে তার নিজের ছবির সামনে এত ভিড় জমে গেছে যে ভিড় ঠেলে সে আর এগোতে পারে না। তার ছবি ঘিরে নিবিড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নানা দেশের ছেলেমেয়ে — আফ্রিকান, ভারতীয়, জাপানী, ইতালীয়, ফরাসী আর চিলিয়রা। ওদের সকলের মুখ বিষণ্ণ আর গম্ভীর।

রুশদেশের রূপকথা

ছোট্ট টম আফ্রিকাতে থাকতেই রাশিয়ায় যাবে বলে তৈরি হওয়ার সময় বিখ্যাত রুশ কবি আলেক্সান্দর পুশ্‌কিনের লেখা রূপকথা পড়ে। পুশ্‌কিনের পূর্বপুরুষরাও যে আফ্রিকান ছিলেন এর জন্য টমের গর্বের সীমা ছিল না।

টমের সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছিল 'জার সালতানের রূপকথা'। মনে মনে সে ভাবত বইয়ে যে-সমস্ত আলৌকিক বর্ণনা আছে সেগুলো বাস্তবে ঘটলে কী ভালোই না হত! টম যখন গোপনসূত্রে জানতে পেল, শিগগিরই 'বরুণ উৎসবে' সে তার প্রিয় রূপকথার কোন কোন চরিত্রকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে তখন সে বিশ্বাস করতে পারল না।

আলেক্সান্দর পুশ্‌কিনের মায়ামন্ত্রময় 'জার সালতানের রূপকথা' রচনায় অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্ত ঘটনার বর্ণনা আছে। অপূর্ব এক রাজহংসী সুন্দরী রাজকুমারীতে পরিণত হয়, নির্জন দ্বীপে রাতারাতি গড়ে ওঠে এক নগরী, অসীম ক্ষমতাশালী নৃপতির আজ্ঞায়, তাঁর তুষ্টিবিধানের জন্য মহাকায় অনুচরবৃন্দ সঙ্গে নিয়ে গভীর সমুদ্রগর্ভ থেকে প্রত্যহ তীরে উঠে আসে মহাবলশালী সাগর বুড়ো।

উৎসবের দিনে উপকূল সরণি পতাকা আর ফুলে ফুলে ছেয়ে গেল। এখানে অনুষ্ঠান হবে। পৃথিবীর সমস্ত ভাষায় খুশির গান বেজে উঠল।

অবশেষে সমুদ্রের বুকে দেখা দিল নৌকো, লঞ্চ আর হাইড্রোপ্লেনের পুরোদস্তুর একটা নৌবহর।... তীরে এসে ভিড়তে সেগুলোর ভেতর থেকে নামে রঙবেরঙের পোশাক পরা জলকন্যা আর জলদস্যুদের একটা দঙ্গল। জলকন্যারা নাচে, জলদস্যুরাও তাদের সঙ্গে তাল দিয়ে নাচতে থাকে, গমগম আওয়াজ করে বাজতে থাকে বাজনা। এমন সময়... আচমকা নেমে এলো গভীর নিস্তব্ধতা, সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করতে থাকে শুধু সমুদ্রের তরঙ্গাঘাত। জলকন্যা আর জলদস্যুরা স্তম্ভিত হয়ে যায়, সমুদ্রের ওপর থেকে তাদের দৃষ্টি আর সরে না। স্তম্ভিত হয়ে যায় টমও। না, ব্যাপারটা এতদূর অবিশ্বাস্য, এমনই অসম্ভব যে টমের নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার মতো অবস্থা! তার চোখের সামনে সমুদ্র যেন সরে গিয়ে পথ করে দিল আর তার ভেতর থেকে ধীরে ধীরে তীরে উঠে এলো মহাকায় বীরপুরুষের দল আর সেই সঙ্গে স্বয়ং সাগর বুড়ো!

তবু, বলা যায় না এই ভেবে টম সেই বীরপুরুষদের একে একে গুনে দেখল — তেত্রিশজন! ঠিক যেমন লেখা আছে পুশ্‌কিনের রূপকথায়। সন্দেহ নেই যে এরা তারাই — পুশ্‌কিনের রূপকথার বীরেরা — গায়ে জালি বর্ম, হাতে বর্শা! টম এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে সাগরতলের এই অধিবাসীদের পিঠে যে অক্সিজেনের সিলিন্ডার বাঁধা আছে সেটা তার নজরেই পড়ে নি।

বীরপুরুষেরা সমুদ্রের দিকে মুখ করে তীরে সার বেঁধে দাঁড়াল। তারা বর্শা তুলল, বর্শা নাড়িয়ে তারা বরুণদেবের আগমনকে স্বাগত জানাল। রূপকথার এই দেবতার মূর্তি একদিকে যেমন ভয়ঙ্কর অন্য দিকে তেমনি অসাধারণ দরদভরা। মোটকথা, কেউই তাঁকে দেখে ভয় পেল না। ক্যাম্পের ছেলেমেয়েরা একটা পাকানো কাগজে মজার এক অভিযোগপত্র তাঁর হাতে তুলে



দিতে তিনি সেটা খুলে পড়ে দোষীদের শাস্তি দেওয়ার হুকুম দিলেন — শাস্তিটা আর কিছুই নয়, তাদের ধরে ধরে তাঁর কৃষ্ণসাগর রাজ্যে চুবুনি দেওয়া। বরুণদেবের হুকুম তৎক্ষণাৎ তামিল হল — আর বলাই বাহুল্য, তাঁর ভৃত্যদের সাহায্যে। জলে চুবুনি খেতে হল পাইয়োনীয়র-লীডারদের।

'আর কোন অভিযোগ আছে?' বরুণদেব বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন।

'আছে,' এই বলে টম এগিয়ে এলো সমুদ্রদেবতার দিকে।

'কী অভিযোগ তোমার?'

টম কোন রকমে ভাঙা ভাঙা রুশীতে বলল যে তার অভিযোগ তার নিজের বিরুদ্ধে — অভিযোগটা এই যে বরুণদেব আর তাঁর তেত্রিশজন বীরপুরুষে তার বিশ্বাস ছিল না।

বরুণদেব তৎক্ষণাৎ টমের রূপকথায়-অবিশ্বাস-রোগ সারিয়ে তোলার আজ্ঞা দিলেন তাঁর ভৃত্যদের। ভৃত্যরা মহা উল্লাসে ছোট্ট আফ্রিকান ছেলেটিকে চেপে ধরে জলে চুবুনি দিয়ে তীরে উঠিয়ে আনল।

টমের কালোরঙের মুখের ওপর ছড়িয়ে পড়ল সাদা ঝকঝকে দাঁতের হাসি। সে মনে মনে ভাবল, 'ক্রিমিয়ার আর্তেকের মাটিতে রূপকথাও তা হলে সত্যি হয়!'

জেলি মাছ শুকানো

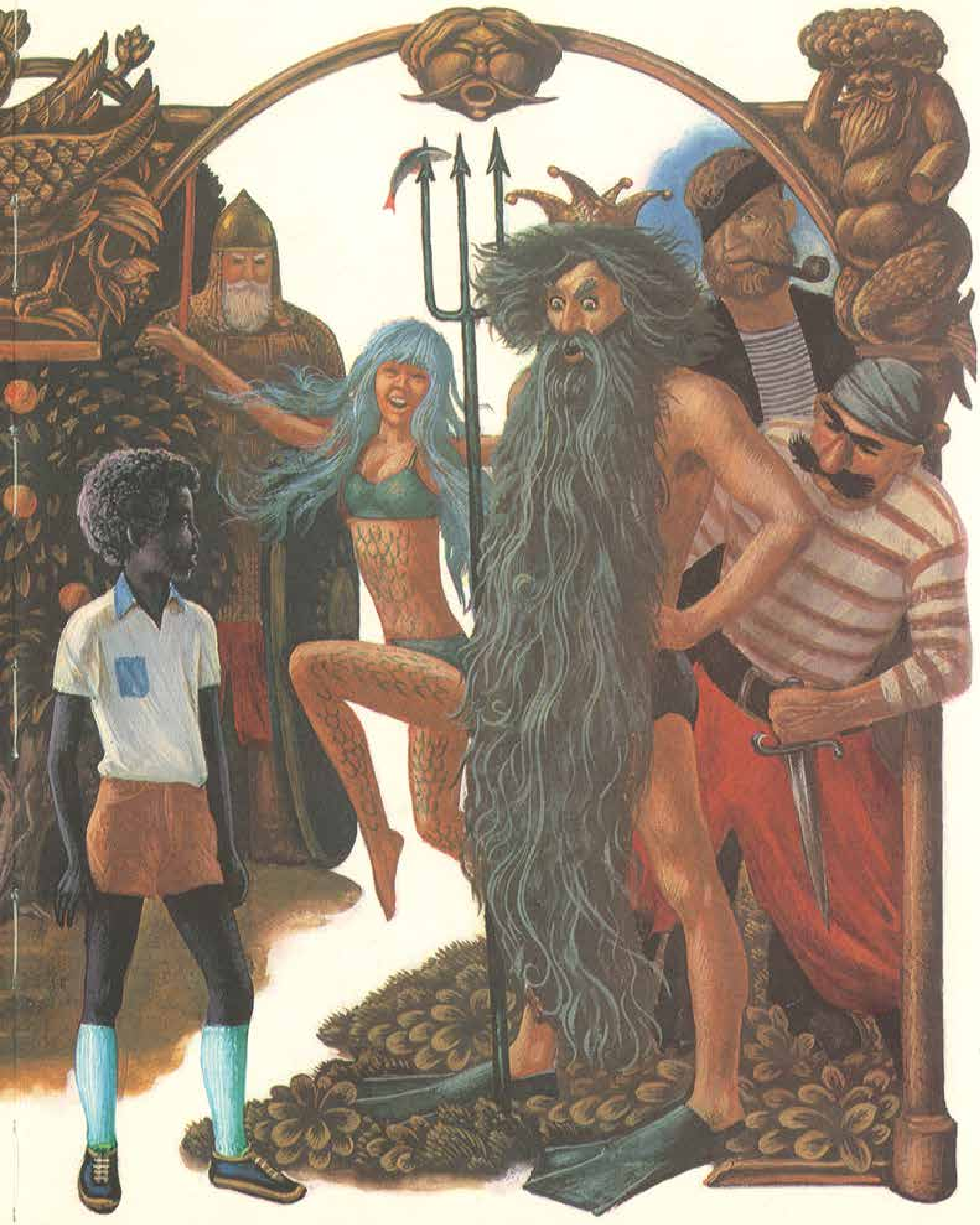
আর্তেকে যারা যাচ্ছে তাদের স্কুলের বন্ধুবান্ধবেরা সচরাচর আর্তেক থেকে কিছু না কিছু জিনিস নিয়ে আসতে বলে। কেউ বলে নানা রকম গাছপালা ও লতাপাতা শুকিয়ে সংগ্রহ করে আসতে, কেউ সমুদ্রের ঝিনুক, কারও বা ঝোঁক খনিজ পাথরে। তাই আর্তেকের ক্যাম্পে যেমন রেডিও অপারেটর, পর্যটন বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসা সহকারী, রেফারী, টেবিলটেনিস কোচ — এই রকম সব বৃত্তি আছে, তেমনি আছে আরও একটা বৃত্তি — সংগ্রাহকের বৃত্তি, যার কোন লিখিত উল্লেখ ক্যাম্পের কোথাও নেই।

গোল ছাঁদের মুখ, হাসিখুশি চেহারার ছেলে মিতিয়া আর্খিপভ। সে কথা দিয়েছিল অসাধারণ একটা কিছু নিয়ে আসবে। কথা ত দিয়ে বসল, কিন্তু 'অসাধারণ বস্তুটা' যে কী, নির্দিষ্ট করে বলল না। কেন? তার কারণ সে নিজেই জানে না সেটা কী হতে পারে।

একবার মিতিয়া জেটিতে উঠে জলের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। সমুদ্রের জল স্বচ্ছ, তার ভেতরে, দেখে মনে হয় যেন অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে, পরম নিশ্চিন্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাছেরা, সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে ঝিনুকদের গা, সাঁতার কাটছে জেলি মাছের ঝাঁক। এই জেলি মাছগুলো দেখেই মিতিয়ার মাথায় একটা চিন্তা খেলে গেল।

সে তীরে ছুটে গেল। স্কুলে সংগ্রহের জন্য প্রজাপতি ধরার যে রকম জাল ব্যবহার করা হয় সেই রকম একটা জাল আর একটা বালতি যোগাড় করে এনে জেলি মাছ ধরতে লেগে গেল। বেশ কিছু জেলি মাছ ধরা পড়ার পর সে
















ОТ ЧИЛИ
ПРОЧЬ

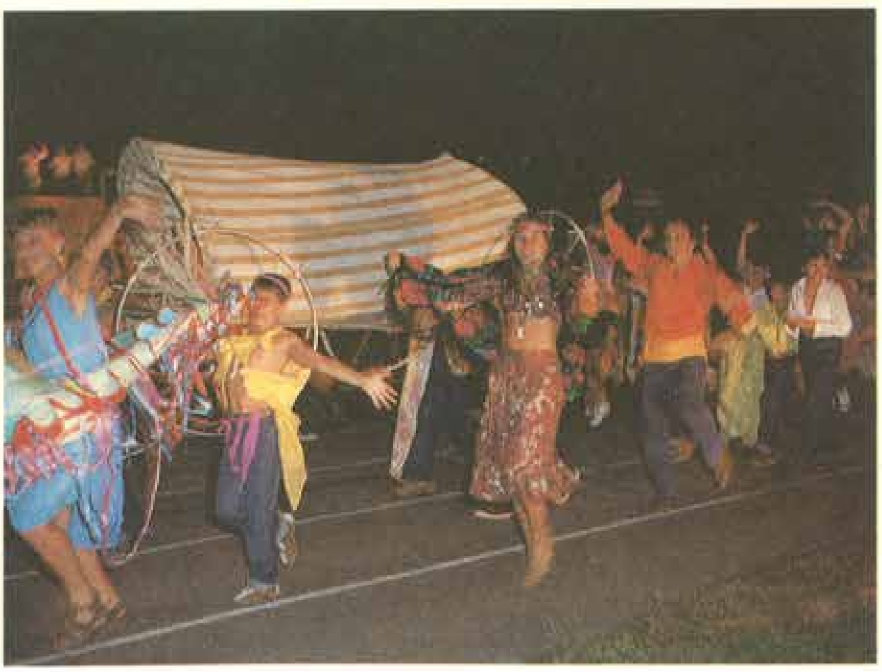




আর্তেকে উৎসব-অনুষ্ঠান, খেলাধুলো এবং নানা রকম কাজকর্মে সব সময়ই বহু জনের ভিড়, সেগুলো বর্ণাঢ্য এবং চিত্তাকর্ষকও হয়ে থাকে।







তার শিকার তীরে নিয়ে এলো। জেলি মাছগুলোকে কাগজের পাতায় ছড়িয়ে দিয়ে একটা নির্জন জায়গায় শুকোতে দিল। বলা ত যায় না, রোদে যদি পুড়ে যায় — এই ভেবে মিতিয়া পাইনগাছের পাতাসুদ্ধ ডাল দিয়ে ওগুলোকে সামান্য ঢেকে রাখল।

মিতিয়াকে আর পায় কে! রোদে শুকিয়ে জেলি মাছ বাড়িতে নিয়ে আসা — সোজা কথা না কি! জানতে পারলে আর্তেকের আর সকলে যে হিংসেয় ফেটে পড়বে তাতে সন্দেহ কি! এখান থেকে যাত্রার আগে তারা ওকে জিজ্ঞেস করবে, 'স্কুলের জন্যে কী নিয়ে যাচ্ছিস?' ও তাদের বলবে, 'জেলি মাছ শুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।'

পরের দিন মিতিয়া বড়াই করে অন্যদের বলল যে সে অসাধারণ একটা জিনিস বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে।

'কী? কী সেটা?' সবাই ছেঁকে ধরল।

মিতিয়া ওদের বেশিক্ষণ ধৈর্য পরীক্ষার মধ্যে রাখল না, সে তাদের সমুদ্রের তীরে নিয়ে এলো। এই যে সেই পাইনগাছের পাতাসুদ্ধ ডালটা, দুটো ছোট ছোট পাথর দিয়ে মাটিতে চেপে রাখা হয়েছে।

'এই দ্যাখ তোরা!' উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে সে মাটি থেকে ডালটা তুলে বলল। 'জেলি মাছ শুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি!'

কিন্তু কোথায় জেলি মাছ? তার বদলে খবরের কাগজের পাতার ওপর পড়ে আছে কালো কালো চারটে ছোপ — ঠিক যে কয়টা মাছ সে সমুদ্র থেকে ধরেছিল।

মিতিয়া আর কোত্থেকে জানবে যে জেলি মাছ শোকানো যায় না, তারা স্রেফ ভাপ হয়ে উবে যায়?

নবাগত

খেলা — শৈশবের একটা বিশেষ সুযোগ। আর্তেকে যারা কর্তৃত্ব করছে তারা সকলেই বাচ্চা ছেলেমেয়ে। এই কারণে দুনিয়ায় যত রকমের খেলাধুলো আছে তার প্রায় সবই আর্তেকের ছেলেমেয়েদের কাছে পরিচিত। বুঝতেই পারছ, এখানে যে পৃথিবীর সব দেশের ছেলেমেয়ে আসে! আর আগন্তুকদের ঝুলিতে যে কী থাকে তাও সকলের জানা আছে — থাকে খেলা আর গান। অতিথিরা চলে যায়, কিন্তু তাদের খেলা আর গান থেকে যায়। আর্তেকে সকলে বিশেষ করে ভালোবাসে বাইরের খেলাধুলো—স্পোর্টস। এই জন্য তারা তাদের ক্যাম্পকে অনেক সময় 'স্পোর্টসল্যান্ড'ও বলে থাকে।

কিন্তু আর্তেক কেবল খেলা সংগ্রহই করে না — সে নিজে খেলা সৃষ্টিও করে। এই রকম একটা খেলা বিশ্বের সমস্ত শিশুমহলে আজকাল বেশ পরিচিত। খেলাটার নাম 'স্নাইপার'।

মাঠে, সাইপ্রেস গাছের ছায়ার নীচে চলছিল তুমুল প্রতিযোগিতা। খানিকটা দূরে তোয়ালে কাঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক যুবক এক দৃষ্টে খেলার গতিবিধি লক্ষ করছিল, মনে মনে খেলাটা বোঝার চেষ্টা করছিল। দেখেশুনে মনে হয়

সমুদ্রে স্নান করতে যাচ্ছিল, কিন্তু খেলা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে।

প্রতিযোগিতা চলছিল দুটি দলের মধ্যে। প্রত্যেক দলে দশজন করে খেলোয়াড়, তাদের পরিচালনা করছে একজন করে ক্যাপ্টেন। প্রত্যেক দলের যার যার সীমানা আছে, ক্যাপ্টেনদের আছে নিজেদের সীমারেখা — খেলোয়াড়দের পেছনে। খেলার লক্ষ্য হল বিরুদ্ধপক্ষের কোন খেলোয়াড়কে মার করে দেওয়া — বল্ ছুঁড়ে তার গায়ে মারা — তাহলে সেই খেলোয়াড়কে এসে দাঁড়াতে হবে ক্যাপ্টেনের সীমারেখার পেছনে। মার হয়ে যাওয়া খেলোয়াড়টি অবশ্য পরে যদি তার বিরুদ্ধপক্ষের আর কোন খেলোয়াড়কে মার করতে পারে তাহলে আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসতে পারে।

যুবক খেলার মাঠের কাছাকাছি এসে কাঁধের তোয়ালে একটা ডালে ঝুলিয়ে রেখে ইঙ্গিতে তাকে খেলায় নেওয়ার অনুরোধ জানাল। এটা খেলার নিয়মবিরুদ্ধ, কিন্তু আর্তেকে ছেলেমেয়েরা বড়দের সম্মান করতে অভ্যস্ত। লোকটা অতিথিদের কেউ হবে এই ভেবে তারা ওকে খেলায় নিল, তাড়াহুড়োতে নবাগতকে ভালোমতো নজর করে দেখল না পর্যন্ত।

নবাগত সঙ্গে সঙ্গে খেলায় মেতে উঠল; সে একের পর এক তিনজন খেলোয়াড়কে মার করে দিল। যাদের হয়ে সে খেলছিল তারা মহা খুশি, আর বিরুদ্ধপক্ষ মনে মনে দুঃখ পেল। তাদের হার হল।

খেলা শেষ হলে নবাগত গাছের ডাল থেকে তোয়ালেটা নিল, ওদের জিজ্ঞেস করল খেলাটার নাম কী।

ছেলেরা উত্তর দিল, 'স্নাইপার।'

'বাঃ বেশ নাম ত!' সসম্ভ্রমে এই কথা বলে চোখ ধাঁধানো হাসি হেসে যুবক চলে গেল।

এবারে পাইয়োনীয়র লীডার হেরে-যাওয়া-দলের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'হেরে গেলে বুঝি?'

'হ্যাঁ,' ছেলের দল মুখ গোমড়া করে বলল।

'তা অমন মন খারাপ করার কী আছে?' লীডার অবাক হয়ে বলল।

লীডারের অবাক হওয়াটা ওদের কাছে অদ্ভুত ঠেকল — এই বুঝি মস্করা করার সময়!

'খুশি হওয়ার কী কারণ থাকতে পারে?'

'কেন? খুশি না হওয়ারই বা কী আছে?' লীডার উল্লসিত হয়ে বলল, 'তোমরা যে হেরে গেছ মহাকাশচারী ইউরি গাগারিনের কাছে!'

'গাগারিনের কাছে!' ছেলেদের চোখেমুখে বিস্ময় ও হর্ষ। তারা সঙ্গে সঙ্গে ছুটল ওঁকে অনুসরণ করার জন্য, কিন্তু ততক্ষণে তাঁর আর কোন চিহ্ন নেই। পরে অবশ্য তাদের আবার দেখা হয়েছিল — 'স্নাইপার' খেলার সময় এবং অন্য উপলক্ষেও।

এর পর কত বছরই না কেটে গেছে, কিন্তু এখনও স্পোর্টসল্যান্ডের আদিবাসীর মন্ত্রে নবাগতদের দীক্ষা দেওয়ার সময় আর্তেকে তাদের 'স্নাইপার' খেলতে বলা হয়, যেহেতু এই খেলা পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারীর বড় প্রিয় খেলা ছিল।

বন্ধুত্বের আবহাওয়া

'আর্তেক বলছি!' এই কথাগুলো দিয়ে আর্তেকের রেডিও স্টেশন তার কাজ শুরু করে। তার কল্ নম্বর 'উ-৫' সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আরও বহু দেশের শৌখিন রেডিও অপারেটরদের কাছে পরিচিত।

একবার আর্তেকের কল্ নম্বর ধরতে পেরে তার কণ্ঠস্বরে সাড়া দিয়ে কোন এক শৌখিন রেডিও অপারেটর আর্তেক রেডিও স্টেশনের অপারেটরকে জিজ্ঞেস করল যে কোথা থেকে ক্রিমিয়ায় এসেছে।

অপারেটর উত্তর দিল, মহাকাশ থেকে।

শৌখিন রেডিও অপারেটরটি ভাবল ওকে নিয়ে বোধহয় ঠাট্টা করা হচ্ছে।

সে তাই প্রশ্ন করল, 'আপনি কে বলছেন?'

'একজন মহাকাশচারী। আমার কোড নম্বর 'সীডার', এই বলে আর্তেক রেডিও স্টেশনের অপারেটর বার্তা ধরার সুইচ টিপে উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু উলটো দিক থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সে ভেবেছিল কেউ বুঝি সত্যি সত্যিই ঠাট্টা করছে। আর কেউ জানুক আর না জানুক, সে ত জানে যে 'সীডার' হল স্বয়ং গাগারিনের কোড নম্বর!

কিন্তু তাহলেও নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে খোঁজখবর পাঠাল। উত্তরে যা জানতে পারল তাতে ত সে অবাক! — সত্যি সত্যি তার সংযোগ হয়েছিল মহাকাশচারীর সঙ্গে।

আর্তেকের বেতারকেন্দ্র রুদ্ধদ্বারকক্ষের ভেতরে নয়। বেতার সম্প্রচারণের ব্যাপারে যার যার আগ্রহ আছে তাদের সকলের জন্যই তার দ্বার অবারিত। যে কেউ এসে ট্র্যান্সমিটার রিসিভার কী ভাবে তৈরি হয় শিখতে পারে, মোর্জের টেলিগ্রাফসঙ্কেত শিখতে পারে, বেতার বার্তা আদানপ্রদানের ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। যাদের আগ্রহ আছে, তারা এসে এ সব বিষয় শেখে, আয়ত্তে আনে, এগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়, আর যা যা জানার সেসব জানা হয়ে গেলে বেতারে নিজেদের কণ্ঠস্বর ছাড়ে।

'আমি আর্তেক বলছি! শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, এবারে বার্তা ধরার সুইচ টিপছি।...'

'চমৎকার শোনা যাচ্ছে!.. চমৎকার!..' একে অন্যকে থামিয়ে এই ভাবে পাল্লা দিয়ে আর্তেকের আকাশে চলে পাইয়োনীয়র রেডিও স্টেশনগুলোর কণ্ঠস্বরের আদানপ্রদান। স্বভাবতই অনেক সময় এর মধ্যে প্রশ্ন থাকে — 'আবহাওয়া কেমন?'

'চমৎকার!' সচরাচর এই হয় আর্তেকের অপারেটরদের উত্তর। কিন্তু একবার একজন অপারেটর দিয়েছিল এক অপ্রত্যাশিত উত্তর: 'দিব্যি বন্ধুত্বের আবহাওয়া!'

অপারেটরের কথাটা এই ক্ষেত্রে ঠিক না খাটলেও সে খুব একটা ভুল কথা বলে নি — আর্তেকের আবহাওয়া সব সময় বন্ধুত্বের অনুকূল।

ছবিতে ধরে রাখা

আর্তেকে যা যা ঘটে তার বিবরণ পত্রপত্রিকায় লেখা হয়, বেতারে প্রচারিত হয়; সিনেমা ও টেলিভিশনের পর্দায়ও তা দেখানো হয়। তাছাড়া আর্তেক নিজেও এ সমস্ত সযত্নে রক্ষা করে রাখে তার নিজের স্মৃতিভান্ডারে — কিংবা আরও পরিষ্কার করে বলতে গেলে চলচ্চিত্রভান্ডারে।

আর্তেকে 'আর্তেকফিল্ম' নামে স্টুডিও আছে। যে কোন স্টুডিওর মতো এই স্টুডিওরও আছে নিজস্ব চিত্রনাট্যকার, আছে পরিচালক ও আলোকচিত্রগ্রহণকারী — কেবল তফাত এই যে 'আর্তেকফিল্ম'-এ এরা সকলেই শিশু। শিশু-চিত্রনাট্যকারেরা চিত্রনাট্য রচনা করে, সেই চিত্রনাট্যের অনুসরণে ছবি করে শিশু-পরিচালক আর ছবি তোলে শিশু-আলোকচিত্রগ্রহণকারীরা।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উৎসব, আর্তেকের গণ্যমান্য অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, খেলাধুলোর প্রতিযোগিতা, শিশু ওলিম্পিক্স — আর্তেকে যে যে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে তার সবগুলোর বিবরণ ধাতুর বাক্সে করে এখানকার চলচ্চিত্রসংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হয়।

যে ঘটনার কথা বলতে যাচ্ছি সেটা ঘটেছিল অনেক আগে — বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী গাগারিন তখনও জীবিত। সেই সময় আর্তেকে পাইয়োনীয়রদের তৃতীয় সারা ইউনিয়ন সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সকলে ইউরি গাগারিন সহ অন্যান্য সম্মানীয় অতিথিদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

পাইয়োনীয়র সমাবেশ হল পাইয়োনীয়রদের বড় জমায়েত, যেখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত প্রান্ত থেকে আগত পাইয়োনীয়রদের সমাবেশ ঘটে। আনুষ্ঠানিক পরিবেশে পাইয়োনীয়র সদস্যরা তাদের কার্যকলাপ ও সাফল্যের বিবরণ দেয়, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাদের পরিকল্পনা পেশ করে। পাইয়োনীয়র সমাবেশ— এক ধরনের উৎসবও বটে। ছেলেমেয়েদের নিজেদের তৈরি বড় রকমের বিচিত্রানুষ্ঠান দিয়ে সচরাচর এর পরিসমাপ্তি।

মহাকাশচারী ছেলেমেয়েদের হতাশ করলেন না। উৎসব যখন পুরোদমে চলছে তখন তিনি এসে উপস্থিত হলেন আর্তেকের স্টেডিয়ামে। স্টেডিয়ামে যারা যারা ছিল তারা সকলে একসঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সমস্বরে অভিনন্দন জানাল অতিথিকে।

'গা-গা-রিন! গা-গা-রিন!' রব উঠল।

মহাকাশচারী হাত তুলে ছেলেমেয়েদের অভিনন্দন জানিয়ে নিজের জায়গায় বসে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর দিকে ছুটে এলো সংবাদদাতা আর ক্যামেরাম্যানদের দল — ছোট বড় সকলেই। ইউরি গাগারিন বাচ্চাদের সঙ্গে ঠাট্টাতামাসা করছেন, তাদের অটোগ্রাফ দিচ্ছেন — এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল এক খুদে ক্যামেরাম্যান, কিছুতেই ভিড় ঠেলে তাঁর কাছে এগিয়ে আসতে পারছে না।

'এই খোকা, চলে এসো!' তিনি চেঁচিয়ে ডাকলেন। 'আসতে দাও খোকাকে,' এই বলে তিনি হাত বাড়িয়ে তাকে সামনে এগিয়ে আসার ইশারা করলেন। ছেলেটা ত ঘাবড়ে অস্থির! সে তার হাতের ক্যামেরা নীচে নামিয়ে ফেলল।

কিন্তু মহাকাশচারী তখনও হাসছেন, তাকে কাছে ডাকছেন দেখে ছেলেটার সংবিৎ ফিরে এলো। এবারে সে ক্যামেরা উ'চুতে তুলে গাগারিনের ছবি তুলতে লাগল।

ওর ছবিতে গাগারিন এই অবস্থায়ই ধরা পড়লেন — হাসিখুশি, কাকে যেন ডাকছেন। এখন, এই দৃশ্যটা যখনই আর্তেকে পর্দায় দেখানো হয় তখন হল-এ বসে তা দেখতে দেখতে ছেলেমেয়েদের মনে হয় ইউরি গাগারিন যেন তাদের দিকে তাকিয়েই হাসছেন।

মহাকাশের কথা

আর্তেকের সমস্ত নামী বন্ধুদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন ইউরি গাগারিন। তার কারণ হয়ত এই যে বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারীর সঙ্গে ক্যাম্পের ছেলেমেয়েদের দেখা হওয়ার ঘটনা তাদের স্মৃতিতে এখনও পুরানো হয়ে যায় নি, কিংবা হয়ত বা এই কারণে যে গাগারিন ক্যাম্পে 'মহাকাশপ্রদর্শনী' সংগঠনের কাজ শুরু করেন।

এই প্রদর্শনী দেখার জন্য আগ্রহী ছেলেমেয়েদের সংখ্যা অগণিত — আর্তেকের সকলেই দেখতে চায়। কোন কোন ছেলেমেয়ে আবার রোজই সেখানে যাবার চেষ্টা করে। 'মহাকাশপ্রদর্শনী' আসলে নিছক প্রদর্শনী নয় — মহাকাশবিদ্যা শেখার ক্লাসও বলা চলে একে। তাই বাহিনীর লীডারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে গিয়ে খুদে মহাকাশচারীরা যখন যখন তাদের লীডারের 'কোথায়' 'কেন' প্রশ্নের উত্তরে বলে 'মহাকাশে'... 'ট্রেনিং নেবার জন্য', তখন তারা এতটুকু বাড়িয়ে বলে না।

মহাকাশবিদ্যার ক্লাসে বাস্তবিকই পরিশ্রম করতে হয়। প'য়তাল্লিশ ডিগ্রী কোণ করে চেয়ারে বসে একবার ঘোরার চেষ্টা করে দেখ দেখি! তারপর বেড়ালের মতো তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াও — শুধু তা-ই নয়, গোটা গোটা হস্তাক্ষরে নিজের নাম সই কর, কিংবা হুবহু কোন নক্সা বা রেখা আঁক। নয়ত বিশেষ একটা যন্ত্রে পরীক্ষা দাও জরুরী দরকারের সময় তোমার স্মৃতিশক্তি ঠিক কাজ করে কিনা, অথবা তোমার মনোযোগ মুহূর্তের মধ্যে এক বস্তু থেকে আরেক বস্তুতে চালান করতে পার কিনা।

সেণ্ট্রিফুগ যন্ত্রটা একজনের একটা ছোট্ট চর্‌কির মতো। ঠিক যেন একটা খেলনার চর্‌কি। কিন্তু একবার ঘুরতে আরম্ভ করলে মজা ঢের পাইয়ে ছেড়ে দেয়। সেণ্ট্রিফুগ-চরকিতে চেপে যে ঘুরতে যায়, তার ওজন সাত-আট মিনিটে সাত-আটগুন বেড়ে যায়! তবে হ্যাঁ, এই সেণ্ট্রিফুগ কিন্তু বাচ্চাদের জন্য নয়। ওখানে ওদের ছাড়া হয় না — যন্ত্রটার পক্ষে তারা বড় ছোট। প্রদর্শনীতে এ যন্ত্র ট্রেনিং-এর জন্য রাখা হয় নি, রাখা হয়েছে চর্চা করার জন্য।

এই মহাকাশযানে চেপে ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল ইউরি গাগারিন পৃথিবীর প্রথম মহাকাশযাত্রা সম্পন্ন করেন।

গাগারিনের মহাকাশযানটি এখন মস্কোর জাতীয় অর্থনৈতিক সাফল্য প্রদর্শনীর মহাকাশবিজ্ঞান প্যাভেলিয়নে ঐতিহাসিক প্রদর্শনী বস্তু হিশেবে রাখা আছে।

'মহাকাশপ্রদর্শনী'র প্রদর্শনসামগ্রীর মধ্যে এমন বহু আসল জিনিস আছে যা সম্ভবত অন্য কোন প্রদর্শনীতে দেখতে পাবে না — যেমন, এখানে তোমরা দেখতে পাবে সোভিয়েত মহাকাশযান 'ভস্তোক'-এর চেয়ার, যে প্যারাসুটে করে বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারী পৃথিবীতে নেমেছিলেন সেই প্যারাসুট, তার ট্রেনিংস্যুট, মহাকাশে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম দিককার পাঠানো রকেটগুলোর একটি। এ ছাড়াও আছে লুনোখোদ-১ নামে যে সোভিয়েত চন্দ্রযানটি আমাদের নিত্য সঙ্গী চাঁদের বুক থেকে মাটি তুলে পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিল তার একটা মডেল, মহাকাশচারীদের পোর্ট্রেট, পৃথিবীতে ও মহাকাশে তোলা তাদের ছবি।... আর এই যে সবচেয়ে যা রহস্যময় স্বয়ং সেই মহাকাশ! প্রদর্শনীর একটা হলঘরে সূর্যোদয়ের সময় যেমন হয় সেই ভাবে ধীরে ধীরে আলো জ্বলছে, আর দর্শকদের বিস্ময়মুগ্ধ চোখের সামনে একটু একটু করে উন্মুক্ত হচ্ছে গভীর মহাকাশ, উন্মুক্ত মহাকাশের বুকে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে একজন জলজ্যান্ত মানুষ।... ইনি হলেন বিখ্যাত সোভিয়েত মহাকাশচারী আলেক্সেই লেওনভ, পৃথিবীর প্রথম মানুষ, যিনি উন্মুক্ত মহাকাশে ভ্রমণ করেন।

আর্মেনিয়ার ছেলে আশোত সাগাতেলিয়ান ত সুযোগ পেলে বোধহয় দিন রাত 'মহাকাশপ্রদর্শনী'তেই পড়ে থাকত। আশোত যে মহাকাশচারী হওয়ার স্বপ্ন দেখে একথা তার বাহিনীর কে না জানে? আশোতের বন্ধু নিকিতা ছাড়া আর সকলে এ ব্যাপারে তাকে উৎসাহও দেয়। আশোতের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হওয়া কতটা সম্ভব এই নিয়ে তার বন্ধুর ঘোরতর সন্দেহ।

একবার পাইয়োনীয়র প্রাসাদের স্নিগ্ধ শীতল হলঘরের ভেতর থেকে দুই বন্ধুতে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরের মধ্যে বাইরে বেরিয়েছে। দু'জনেই নিজেকে কোন মহাকাশযানের ক্যাপ্টেন বলে মনে মনে কল্পনা করে সেই চিন্তাতে মশগুল। আশোত তার মহাকাশযানে চেপে ইতিমধ্যে সপ্তর্ষিমণ্ডলের কোথায় চলে গেছে, এমন সময় তার বন্ধুর কণ্ঠস্বর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলো পৃথিবীর মাটিতে।

'ফাঁকা স্বপ্ন,' সমালোচকের দৃষ্টিতে আশোতের ওপর চোখ বুলাতে বুলাতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল।

'কেন, ফাঁকা হতে যাবে কেন?' আশোত খেপে গেল।

'ফাঁকা বলছি এই জন্যে যে যাদের চোখ খারাপ, যারা দূরের জিনিস ভালো দেখতে পায় না, তাদের মহাকাশে উড়তে দেওয়া হয় না,' নিকিতার সাফ জবাব।

আশোত সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রচালিতের মতো তার চশমার দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র সে নয়।

'আমি খুব জোর পড়াশুনো করব। পড়াশুনো করে করে যখন অনেক শেখা হয়ে যাবে, আমি একটা বড়ি বার করব,' সে বলল।

'কিসের আবার বড়ি?' নিকিতার চোখেমুখে প্রশ্ন আর কৌতূহলের চিহ্ন।

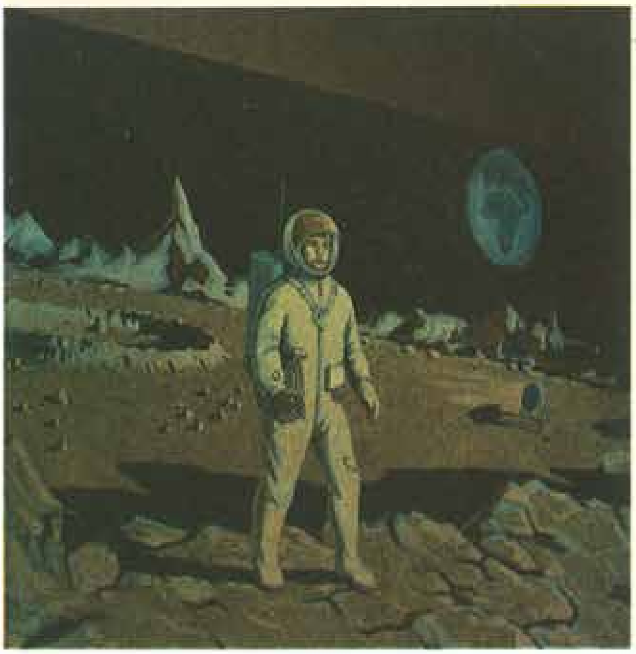
'চোখ খারাপের!' আশোত বলল।

আর্তেকের উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় সবই তার কাছে অবারিত ও বাস্তব বলে মনে হয়।



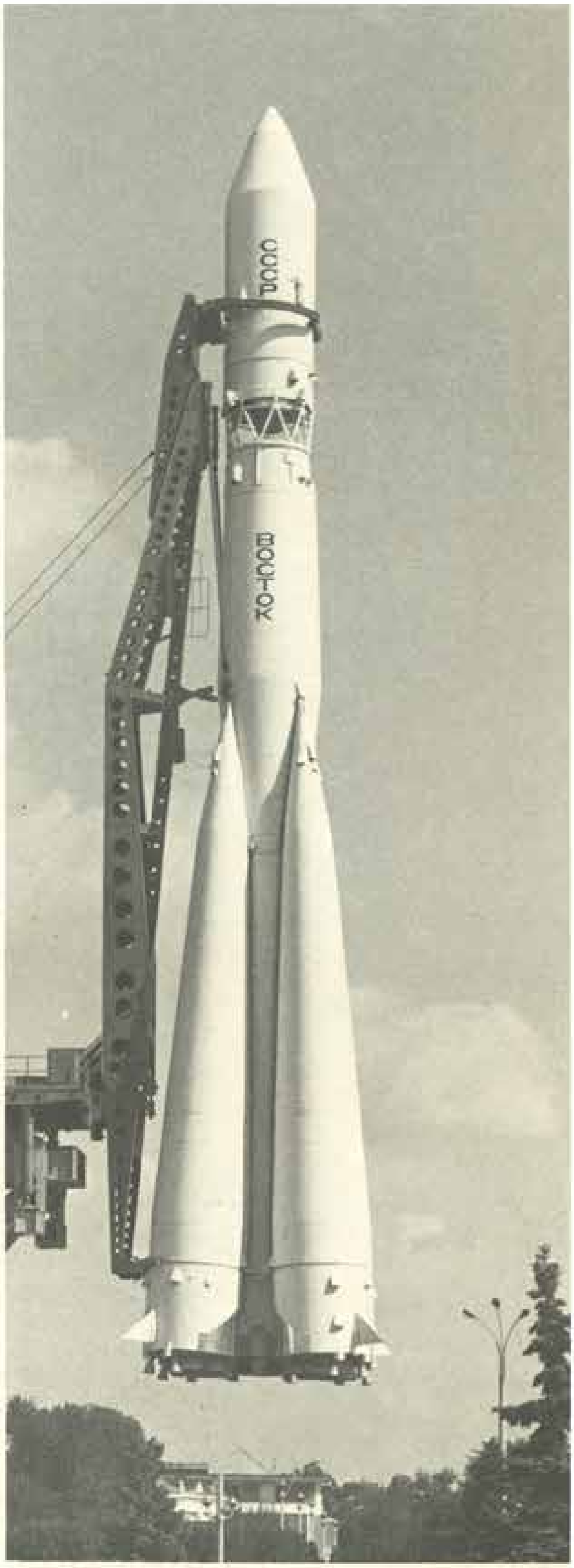
আর্তেকের পাইয়োনীয়রদের মাঝখানে মহাকাশচারী ইউরি গাগারিন।

মহাকাশ-প্রদর্শনীতে।





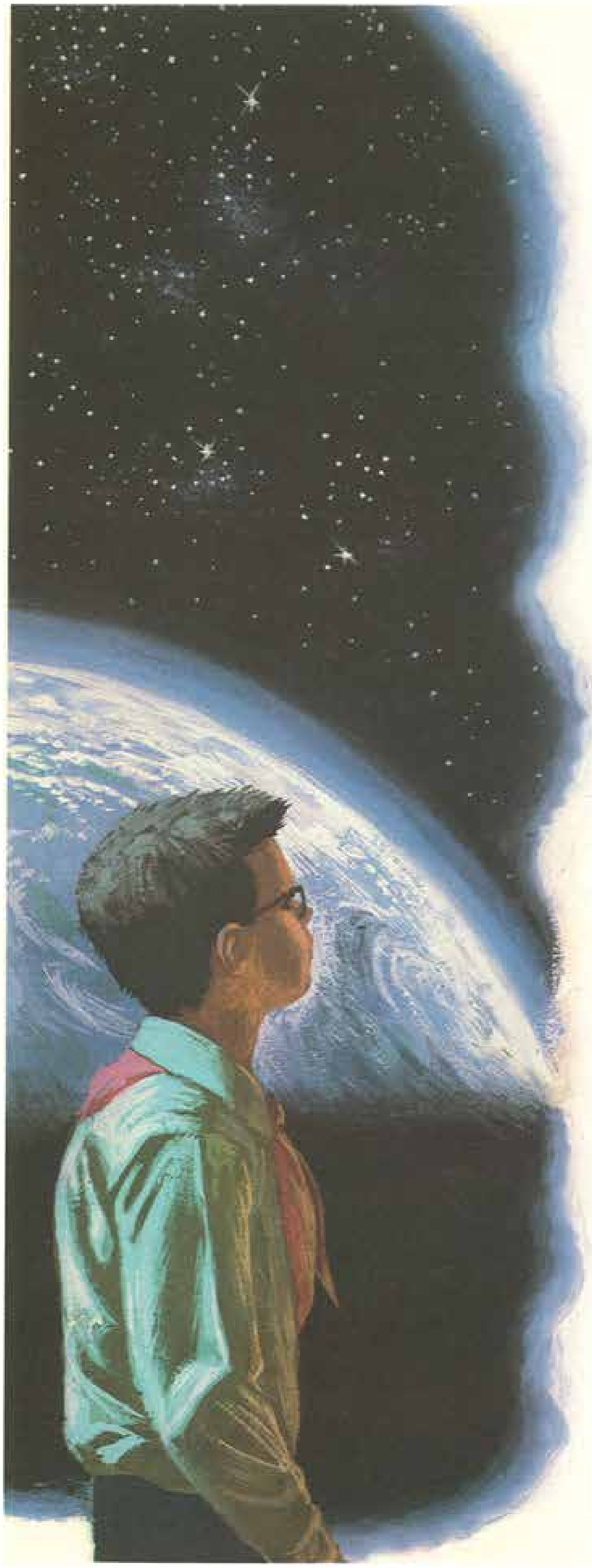




খেয়ালখুশি কল্পনা

আর্তেকের ক্যাম্প বাসিন্দাদের সবচেয়ে ছোট দলকে বলা হয় ইউনিট। তার ওপরে, মাঝারি দল হল বাহিনী, আর সবচেয়ে বড় — স্কোয়াড। কিন্তু এই পরিবারের প্রধান হল বাহিনী। বাহিনী নিয়ে ছেলেমেয়েরা পদযাত্রায় বের হয়, বাহিনীতে তারা খেলাধুলো চর্চা করে, নানা রকম বিচিত্রানুষ্ঠান প্রতিযোগিতার আয়োজন করে, ছেলেমেয়েদের বুদ্ধি ও ক্ষমতা পরীক্ষার অনুষ্ঠান করে।

বাহিনীর জীবনযাত্রার মধ্যে প্রধান ঘটনা হল ছোটখাটো জমায়েত। এ ধরনের জমায়েত যেমন নিয়মিত হয়, তেমনি আবার জরুরীও হতে পারে। সাধারণ বা নিয়মিত পর্যায়ের ছোটখাটো জমায়েতের জন্য ছেলেমেয়েরা আগে থাকতে তৈরি হয়, কিন্তু জরুরী হলে ঐ রকম তৈরি



হওয়ার কোন সময় থাকে না। বিউগল বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে বাহিনীর সকলকে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়, তারপর তারা রওনা দেয় জমায়েতের জায়গার দিকে। যেতে যেতে ভাবতে থাকে, ভেবে ভেবে কূল পায় না কোথায় ওদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কেনই বা নিয়ে যাচ্ছে। মহাকাশচারীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য? নাকি রাতে সামুদ্রিক ঝড়ে ডলফিনদের পাড়ে আছড়ে ফেলেছে বলে তাদের উদ্ধারের জন্য? সে যা-ই হোক না কেন, যে-কোনটার জন্যই তারা তৈরি। আর্তেকের ছেলেমেয়েরা ক্ষতিকর পোকামাকড়ের হাত থেকে আঙুর খেত বাঁচাতে সাহায্য করেছে, মহাকাশচারীদেরও তারা একাধিকবার অভিনন্দন জানিয়েছে, ডলফিনদেরও বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে — এমন ঘটনা ত এর আগেও ঘটেছে।

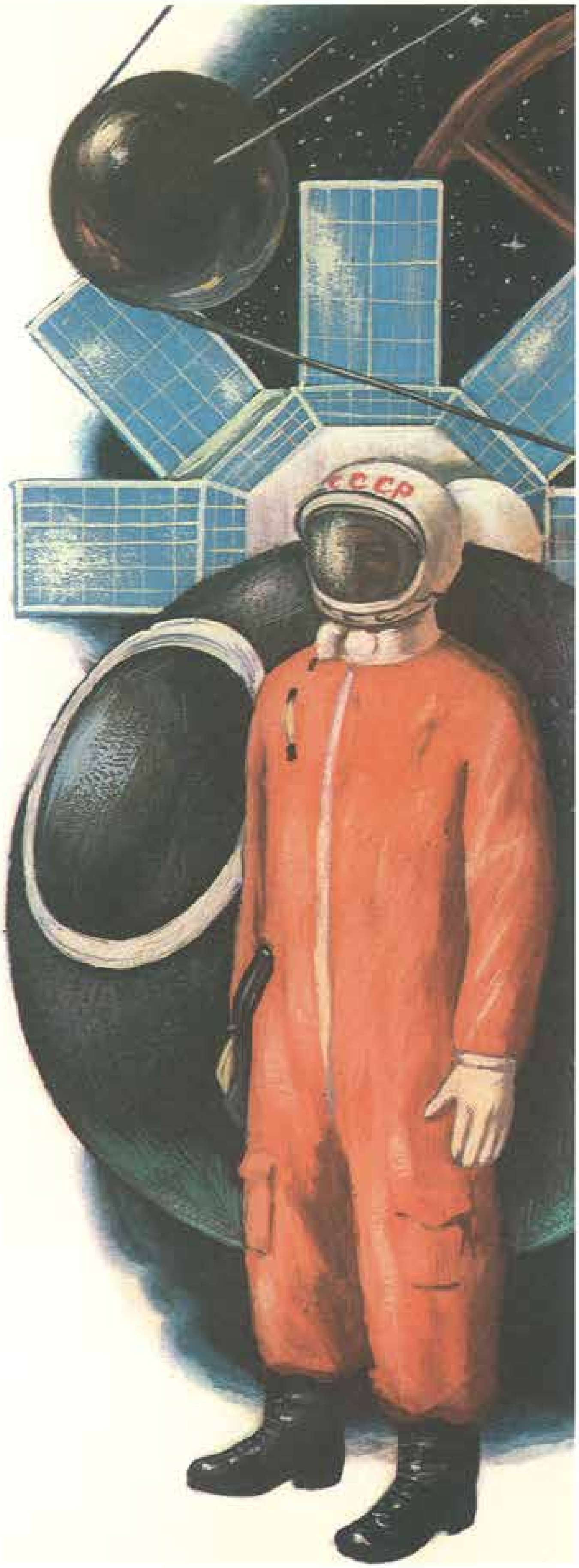
একবার মরশুমের শেষ দিকে 'সাগর' ক্যাম্পে এই রকমই একটা ঘটনা ঘটল। একটা বাহিনীর সকলে একসঙ্গে জড় হয়ে যাত্রা শুরু করে দিল— কোথায়, কেউ জানে না। হাঁটতে হাঁটতে তারা এসে হাজির হল বাহিনীর সভা-অনুষ্ঠানের অতি প্রিয় জায়গা সামার প্যাভেলিয়নে। সকলে জায়গায় গিয়ে বসল। অবাক হয়ে চার দিকে তাকিয়ে দেখল। সারা দেয়াল জুড়ে বড় বড় কাগজের টুকরো ঝুলছে। পরিষ্কার কাগজ, কাগজের গায়ে এতটুকু আঁচড় পড়ে নি। এগুলোর ওপর ছবি আঁকা থাকলে না হয় বোঝা যেত ওদের কোন এক্‌জিবিশনে নিয়ে আসা হয়েছে। তা-ই যদি না হবে তাহলে ওগুলো এখানে ঝুলানো হল কেন? আর টেবিলের ওপর ওগুলোই বা কী? এ যে দেখছি কয়েক প্রস্ত রঙ আর তুলি! কে জানে, ক্যাম্পে হয়ত কোন শিল্পী এসেছেন, ওরা তাঁকে যেমন যেমন

বলবেন সেই রকম সব ছবি আঁকবেন তিনি?

কিন্তু বাহিনীর পরিষদ-প্রধান ওদের সব বুঝিয়ে দিল।

'আমরা পাইয়োনীয়রের 'খেয়ালখুশি' পোস্টার প্রতিযোগিতা শুরু করছি,' সে বলল। প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু — 'দু'হাজার সালে আর্তেক'।

ছেলেমেয়েরা রঙ তুলি বেছে নিয়ে কাগজের টুকরোগুলোর সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভবিষ্যতের নানা রকমের উদ্ভট উদ্ভট কল্পনা তাদের মাথার ভেতরে পাক খেতে লাগল। কিন্তু প্রত্যেকেই যার যার নিজের পরিকল্পনার কথা ভাবতে ভাবতে তাদের পাশের ছেলেমেয়েদের দিকেও আড়চোখে তাকাচ্ছিল। তোনিয়া ইয়াকভ্‌লেভা কী যেন একটা ছবি আঁকছিল — অন্যেরা প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। তোনিয়ার কাগজে ছবির যে রকম রেখাগুলো পড়েছে তা দেখে মনে হচ্ছিল সে আদালার নামে জোড়া পাহাড় আঁকছে। বলার কিছু নেই, পাহাড়দুটো দেখতে সত্যিই অপূর্ব। নিসর্গের দুই শিল্পী — সমুদ্র আর বায়ু তাদের কী মহিমাই না দান করেছে! বাহিনীর ছেলেমেয়েরা বহুবার বেড়াতে এসে সাগরতীর আর সমুদ্র থেকে তাদের দেখে দেখে তারিফ করেছে। কিন্তু ভবিষ্যতের সঙ্গে এই জোড়া পাহাড়ের সম্পর্ক কী? কী হতে পারে? এরা আজ যেমন আছে ভবিষ্যতেও তেমনি থেকে যাবে। ভবিষ্যৎ বলতে ত আমরা বুঝি মহাকাশ, গ্রহনক্ষত্র — এই সব। আর তোনিয়া কিনা নিয়েছে 'পার্থিব' বিষয়, আঁকছে সে আদালার! ও হয়ত ঐ পাহাড়দুটোর গায়ে রেলিং দেয়া বারান্দা-টারান্দা লাগিয়ে দেবে, যাতে লোকে



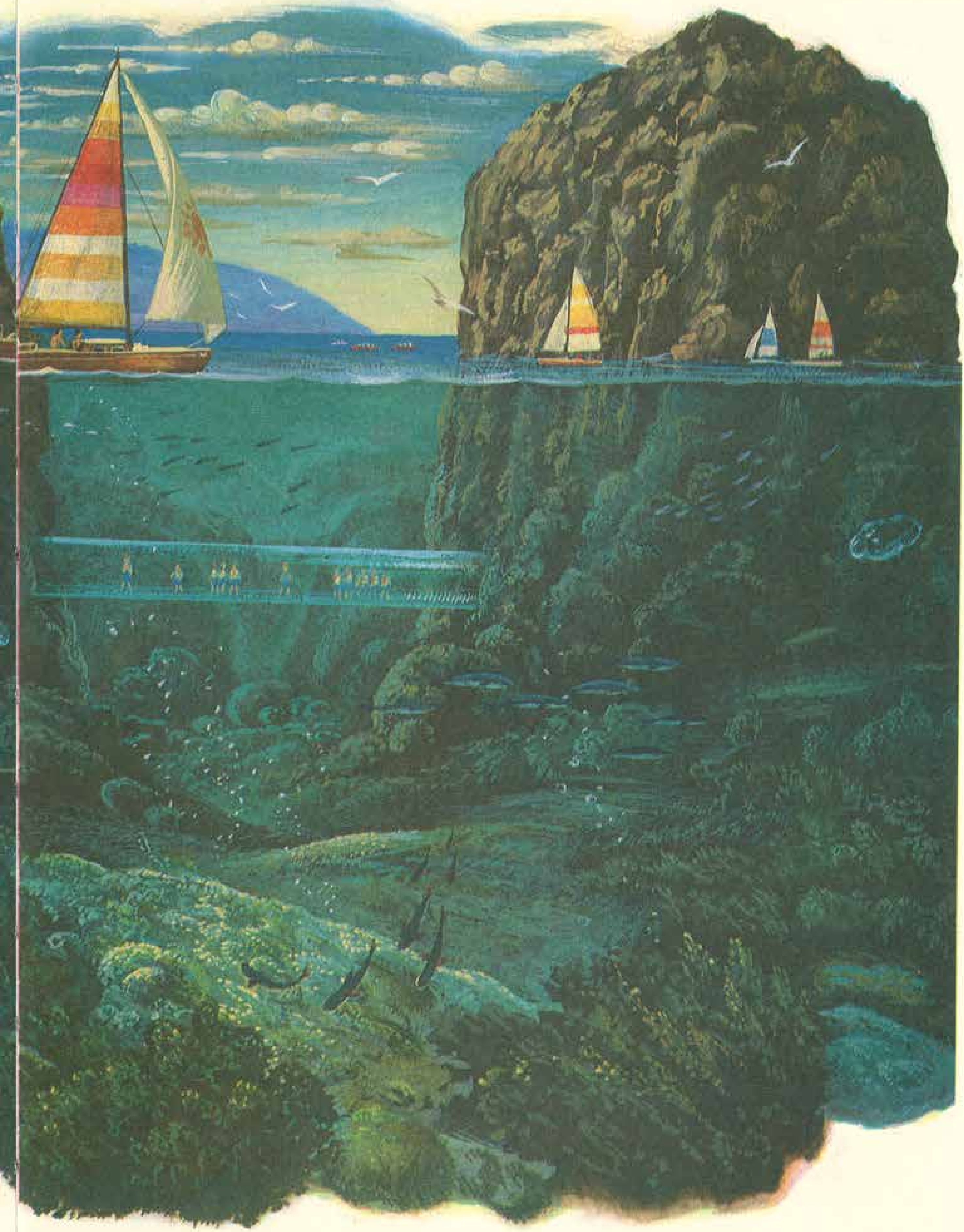
সমুদ্রে পড়ে না যায় — এ-ই বুঝি ওর ভবিষ্যৎ! না, না, ওরা আর্তেকের ভবিষ্যৎ আঁকবে অন্য রকম করে।

সেকালের লোকেরা বলে, এক সময় দুই যমজ ভাই ছিল। তারা দু'জনে দুই বোনকে ভালোবাসে — সেই দুই বোনও আবার যমজ। দুই ভাইয়ের ছিল এক যাদু-কৌটো — উঁচু আকাশে আর গভীর সমুদ্রের কোথায় কী হচ্ছে কৌটোটা তার বৃত্তান্ত দিত। এক যাদুকর ওটা তাদের উপহার দিয়েছিল। সে তাদের বলে দিয়েছিল কারও কোন বড় রকমের বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলে তবেই যেন ওরা ওটা খোলে, মিছিমিছি যেন স্পর্শ না করে। ওরা কিন্তু তার কথা শুনল না। স্রেফ অলস কৌতূহলের বশে তারা আর ঐ দুই বোন ঊর্ধ্বে আকাশে আর সমুদ্রের অতল গর্ভে কী কী ঘটছে তা দেখানোর জন্য কৌটোটাকে চেপে ধরতে সে ওদের তা দেখাতে বাধ্য হল। এর জন্য যাদুকর ওদের শাস্তি দিল। দুই ভাই আর সেই দুই বোনকেও পাথর করে দিল, তারা আদালার পাহাড় হয়ে গেল।

ক্যাম্পের ছেলেমেয়েরা মাথা খাটিয়ে কত জিনিসই না বার করেছে! — আর্তেক থেকে মঙ্গল ও শুক্রগ্রহের দিকে উড়ে চলেছে রকেট, আর্তেক মহাকাশচারীরা বেরিয়ে এসেছে উন্মুক্ত মহাকাশে, খুদে মঙ্গলগ্রহবাসীরা উড়ে এসেছে আর্তেকে, এমন কি চাঁদের বুকেও একটা 'আর্তেক'!

কিন্তু তোনিয়া এ কী করেছে! সে এ'কেছে মোটে দুটো জোড়া পাহাড়। কিন্তু ছবিটা আঁকা শেষ হতে সকলে যখন সেটা দেখল তখন আর





কেউ সেখান থেকে দৃষ্টি সরাতে পারে না।

পাহাড়গুলো প্রকৃতিতে যেখানে দাঁড়িয়ে থাকার কথা সেখানেই আছে। কিন্তু পাহাড় থেকে পাহাড়ে জলের তলা দিয়ে চলে গেছে কাচে বাঁধানো সরু গলিপথ, সেখান দিয়ে চলেছে লাল টাই বাঁধা যত রাজ্যের বাচ্চা। গলিপথের চারধারে কিলবিল করছে বরুণদেবের রাজ্যের অধিবাসীরা, আর ওপরে আদালারের চুড়োর দিকে চলে গেছে একটা স্বচ্ছ ঝলমলে সুড়ঙ্গ পথ — তার ভেতরে চলাচল করছে লিফট।

কারও কোন সন্দেহ রইল না যে 'খেয়ালখুশি কল্পনার' পুরস্কারটি তোনিয়া ইয়াকভ্লেভার ভাগ্যেই ঝুলছে। আর সত্যি সত্যিই সে ঐ পুরস্কার পেলও — সঙ্গে সঙ্গে স্মারকচিহ্ন হিশেবে ছবির উলটো পিঠে বাহিনীর সব ছেলেমেয়েদের নামের স্বাক্ষর।

একটা গান বাঁধার ইতিহাস

ঐদিন আর্তেকের সবাইকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল— সূর্য, সমুদ্র আর ভালুক-পাহাড় — সবাই। সূর্য মেঘে ঢেকে গেল। এমন ঘটনা এখানে কদাচিৎ ঘটে। সমুদ্র রাগে ভ্রূকুটি পাকিয়েছে — এমন ঘটনাও সচরাচর ঘটে না। আর ভালুক-পাহাড়ের মাথাটাই যেন কুয়াসায় ঢেকে গেছে — আর্তেক ক্যাম্পের ছেলেমেয়েরা আজ এই মুহূর্তে নিজেদের মধ্যে যে বিষণ্ণ বিদায়বাণী বিনিময় করছে তা যাতে কানে না শুনতে হয় সেই জন্যই যেন তার এই পন্থাবলম্বন। আর্তেক মরশুমের এক পালার আগন্তুকদের বিদায় দিচ্ছে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাওয়ার জন্য পাহাড় থেকে বাস নেমে এলো বলে।

সোনালি চুলওয়ালা ভিতিয়া মুসাতভের ইউনিটের সকলে চুপচাপ প্যাভেলিয়নে বসে ছিল। লোকে যখন বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নেয় তখন কথা বলার বিষয় খুঁজে পাওয়া কেমন যেন বেশ কঠিন হয়ে পড়ে।

'গান গাইলে কেমন হয়?' জোইয়া তিমফেয়েভা বলল।

'কী নিয়ে?' মুখ গোমড়া করে বলল রুস্লান বব্কোভ। 'সব গানই গাওয়া হয়ে গেছে, বহুবার গাওয়া হয়ে গেছে।'

'তাহলে নিজেরাই একটা বানাই না কেন?' জোইয়া বলল।

'হা-হা-হা,' রুস্লান হাসতে হাসতে বলল, 'গান লেখার লোক এলেন আমার!'

কিন্তু ওর কথায় কেউ সায় না দিতে রুস্লান থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

আবার অনেকক্ষণের জন্য নেমে এলো নীরবতা। হঠাৎ সেই নীরবতা ভেদ করে কে যেন গুনগুন করে ধরল:

'দশে মিলি রচিলাম এই গান, এই গান...'

গান ধরেছিল ছোট্ট মেয়ে লেনা জাগোরুইকো। সকলে কান খাড়া করল। ভিতিয়া মুসাতভ জিজ্ঞেস করল:

'গানটা কী নিয়ে?'

'এখনও জানি নে,' লেনা বলল।

'আমি কিন্তু জানি,' হঠাৎ বলে উঠল পেতিয়া গর্বাচিওভ, তারপর সুর করে বলে উঠল, 'আর্তেকে কী সুখে ছিলাম! সবে, এক মনপ্রাণ, সবে এক মনপ্রাণ।'

'বাঃ, বেশ ত!' এই বলে ভিতিয়া মুসাতভ ধরল, 'দশে মিলি রচিলাম এই গান, এই গান: আর্তেকে কী সুখে ছিলাম! সবে এক মনপ্রাণ, সবে এক মনপ্রাণ!'

'এইত হচ্ছে, দিব্যি হচ্ছে!' সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল মাশা। 'আচ্ছা, পরে হবে এই রকম: রোদে পুড়ে এঘাটে ওঘাটে হই কালো কেলে, হই কালো কেলে...'

'বেশ ত রোদে পুড়ে কালো কেলেই না হয় হলাম। কিন্তু তারপর?' রুস্লান বব্কোভ জিজ্ঞেস করল।

'তারপর তাহলে বলি!' ফুটবলের পরম ভক্ত মিতিয়া অগুর্ৎসভ যোগ করল, 'সন্ধ্যা কখনও নামে, সূর্য যায় পাটে ফুটবল খেলে, ফুটবল খেলে...'

হঠাৎ সকলের মধ্যে জেগে উঠল সুপ্ত কবিপ্রতিভা। হুড়োহুড়ি করে গানে তাদের কথা বসানোর জন্য তারা লেগে গেল। দলের লীডার ভিতিয়ারও ইচ্ছে হল একটা লাইন যোগ করে। সে গাইল, সদা ছিনু মিলেমিশে...'

'আমাকে গাইতে দাও, আমাকে!' লাজুক স্বভাবের মেয়ে গালিয়া মালিনোভ্স্কায়া লাফিয়ে উঠে বলল। ব্যাপারটা ছিল এতই আকস্মিক যে সকলে চুপ করে গেল। দলের মধ্যে গালিয়ার মতো ঠাণ্ডা চুপচাপ আর কেউ ছিল না। বোঝাই যাচ্ছে সৃষ্টির নেশা তাকেও পেয়ে বসেছে।

'চালিয়ে যা,' ভিতিয়া বলল।

'তাহলে শোনো, এই যে...' লজ্জায় লাল হয়ে উঠে গালিয়া গাইল, 'ছেলেমেয়ে ভেদ কিসে, নেই জানা, নেই জানা...'

'আজি এই বিদায়ের ক্ষণে...' ভিতিয়া মুসাতভ ধরল।

'গাহি গান ব্যথা নিয়ে মনে,' তৎক্ষণাৎ জুড়ে দিল মাশা।

'বিদায় বান্ধবী সবে,' মিতিয়া অগুর্ৎসোভ চেঁচিয়ে বলল।

'বিদায় বন্ধুরা তবে!' লেনা জাগোরুইকো শেষ করল।

'আরে ধুৎ!' হঠাৎ লীডারের টনক নড়ল। 'বানালে ত খুব, কিন্তু টুকে রাখার কথা ত কারও মনে থাকল না!'

'মনে থাকল না মানে!' ইউনিটের লিপিকার গ্রিশা ক্রাম্নশেচকভ লাফিয়ে উঠে বলল। 'এই যে গান, এখানে লেখা আছে,' এই বলে সে একটা নোটবই বার করে সকলকে দেখাল। ওটার ওপরে লেখা ছিল: 'আমাদের ইউনিটের দিনলিপি, লিপিকার গ্রিশা ক্রাম্নশেচকভ'।

'সবটা পড়ে শোনা,' ভিতিয়া বলল।

গ্রিশা পড়ে শোনাল:

দশে মিলি রচিলাম
এই গান,
এই গান:
আর্তেকে কী সুখে ছিলাম!
সবে এক মনপ্রাণ,
সবে এক মনপ্রাণ!
রোদে পুড়ে এ ঘাটে ও ঘাটে
হই কালো কেলে,
হই কালো কেলে।
সন্ধ্যা কখনও নামে, সূর্য যায় পাটে
ফুটবল খেলে, ফুটবল খেলে।
সদা ছিনু মিলেমিশে।
ছেলে মেয়ে ভেদ কিসে
নেই জানা,
নেই জানা।





আজি এই বিদায়ের ক্ষণে
গাহি গান ব্যথা নিয়ে মনে।
বিদায় বান্ধবী সবে।
বিদায় বন্ধুরা তবে।
হে আমার অতি প্রিয়জন!
নেমে এলো বিদায়ের ক্ষণ।

'এবোরে সকলে একসঙ্গে!' ভিতিয়া উল্লসিত হয়ে বলল।

ওরা যখন গান গাইতে লাগল এই সময়ের মধ্যে কোন্ এক মায়ামন্ত্রে প্রকৃতি যেন বদলে গেল — রোদ ঝলমল করে উঠল, সমুদ্রের মুখে ফুটে উঠল হাসি, কুয়াসা কেটে গেল, আর ভালুক-পাহাড় যেন জলের ওপরে মাথা তুলে শুনতে লাগল করুণ বিদায়ের আনন্দগীতি।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জা বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে আমরা বাধিত হব।

আশা করি আপনাদের মাতৃভাষায় অনূদিত রুশ ও সোভিয়েত সাহিত্য আমাদের দেশের জনগণের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে আপনাদের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক হবে।

আমাদের ঠিকানা:

'রাদুগা' প্রকাশন
১৭, জুবোভ্স্কি বুলভার
মস্কো ১১৯৮৫৯, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Moscow 119859, Soviet Union
17, Zubovsky Boulevard
'Raduga' Publishers







'রাদুগা' প্রকাশন · মস্কো

ISBN 5-05-001226-0



ISBN 5-05-001226-0